রচনামঞ্জরী

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী

দ্বারা প্রকাশিত।

Calcutta
S K LAHIRI & CO.
54 COLLEGE STREET

1898

পূর্ব্বভাষ।

ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা পাঠ করিলে ভাষায় যেরূপ অধিকার হয়, একজনমাত্র লেখকের রচনা অধ্যয়নে সেরূপ হয় না। কবিতায় যেমন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, আবার গদ্যরচনায় তেমনি লেখকের অন্তস্তলের নিগূঢ় ভাব সকল প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, গদ্য পদ্য উভয়ই প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনাপাঠে পাঠকের অন্তরে যে কেবল বহুবিধ ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে রচনাবৈচিত্রও হৃদয়ঙ্গম হয়। ভাবের বাহুল্য ও তৎপ্রকাশক বাক্যাবলী আয়ত্ত করিতে পারিলেই, ভাষায় অধিকার জন্মিল। স্বয়ং কোন বিষয় রচনা করিতে হইলেও ইহাদ্বারা অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃতবিদ্য লেখকগণের ভাব, রচনার পরিপাট্য, বর্ণনীয় বিষয়ের যথাযথ বিবৃতি, পরস্পরদৃঢ়সম্বদ্ধ অকাট্য যুক্তি প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া অতি সহজে বিষয়বিশেষে রচনা লেখা যাইতে পারে, এবং উহা জনসমাজে অনাদৃত হয়, এমন নহে।

ভাষা ও রচনা-শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে মনে করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইল। এণ্ট্রান্সস্কুলের চতুর্থ ও পঞ্চম, এবং মধ্য বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সাহিত্য পুস্তক অধ্যাপিত হইয়া থাকে, এই পুস্তকের ভাষা তাহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

এক্ষণে পুস্তকখানি তত্তৎ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া বালকগণের ভাষাজ্ঞান ও রচনা-শিক্ষা বিষয়ে কথঞ্চিৎ উপকারী হইলে, উদ্দেশ্য সফল ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বঙ্গকবিশিরোমণি ও বঙ্গসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের স্বস্বরচিত গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকিলাম।

কলিকাতা
মার্চ্চ, ১৮৯৮

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী।

সূচীপত্র।

রচনামঞ্জরী।

কপালকুণ্ডলা। ২৭৭২

সাগরসঙ্গমে।

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল, নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবাপুরুষ এই দুই জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে পিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সম্বাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে, পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইযাছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।"

নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এত বড়

কাজটা খারবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ ভাবিলেন যে কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েচে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিক-দিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণজন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়। কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া

নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা বথায় যায় যাক্, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই, —সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নামকীর্ত্তি করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে। ঐ দেখ ডাঙ্গা।" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত

হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চলরবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ, কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন, যে তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুল পুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপকূলে।

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে

আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। আরোহী-বর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃ-কৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব, কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে,—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলা-কারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে

হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভারবহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন, এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না

হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লুত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগাবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না, প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রমদ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশীমাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে

প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত, তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য ?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখন পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি পামর। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজনে।

যেস্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম

এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুন্নতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাটী, বনঝাউ, এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না, তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকা-রোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত

হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, এখন প্রতিকূল-স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূলস্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল, সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই, নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীত-নিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লূকের সাক্ষাৎলাভ সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন।

ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন।—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, শীতবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন উপত্যকায়, কখন অধিত্যকায়, কখন স্তূপতলে, কখন স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু একস্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্তদিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। একস্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখন কখন নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয়, যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্তূপশিখরে।

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতি মাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেননা এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক ?—হইতেও পারে, কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয় ?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ লতা দলিত করিয়া বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরো-

ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশ-পটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থির সংকল্প করিয়া, অশিথিলীকৃতবেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল – তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল - নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না তাহা লক্ষ্য হইল না, কটিদেশ হইতে জানুপর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল —সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন, ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে - এমন কি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন কি স্থানত্যাগ করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি

কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্র সাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন্।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি, মামনুসর, পরিতোষং তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল, এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে ঐ কুটীর

সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফল মূল যাহা আছে আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ,—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না, সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রতটে।

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটীগমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন, বিশেষ এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এদিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃ সাক্ষাৎপর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম—একারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনে উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্প-পরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ

যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকা-বিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্ব-পরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপ-বেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে,

তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইযা নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

———

জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তান্ত।

বাল্য ও তৎকালিক শিক্ষা।

মিল স্বয়ং বলিয়াছেন যে পিতৃদেবলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসই তাঁহার সুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সভ্যতা ও সমাজ-পদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচন মিলের চিন্তাশক্তিকে অনেক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল। বাল্যকালে ভারতবর্ষ বিষয়ে দীক্ষিত হওয়ায় মিল্ পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরম হিতৈষী বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে জেমস্ মিল ভারতবর্ষীয় কবেসপণ্ডেণ্ট বিভাগের সহকারী পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন। সময়ের এই নূতন বিনিয়োজনায়ও তিনি পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে কিছুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বৎসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ণ ও প্রকটন করেন, সেই গ্রন্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লইয়া পিতা প্রতিদিন ভ্রমণকালে পুত্রকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পুত্র এই রূপে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া, রিকার্ডোর বিস্তৃত গ্রন্থে অবতরণ করেন। রিকার্ডোর পুস্তক সমাপ্ত হইলে,

পিতৃদেব মিলকে আডাম স্মিথ্ লিখিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে, জেমস্ মিল পুত্রকে রিকার্ডোর উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোকদ্বারা স্মিথের যুক্তি সকলের ভ্রম প্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুত্র পিতার আদেশ অনুসারে সেই আলোকদ্বারা স্মিথের ভ্রম প্রমাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় পরিমার্জিত হইয়া উঠিল। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী হয় না। পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্বায়ত্ত কর, ইহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর, এবং সেই সমস্ত মতের উপর নিজের সিদ্ধান্ত সংন্যস্ত কর, তবেই দেখিবে তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে—তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমার্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বিধান করা এবং এরূপ শিক্ষা ধারণা করা, অতি অল্প লোকের সাধ্য। জেমস মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটে। এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জেমস্ পুত্রকে অগ্রে কোন বিষয় বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকে সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সক্ষম না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন। এইরূপে মিল শৈশবেই চিন্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈষৎ পরিপক্ব বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরাভবে পরিণত হইত।

এই রূপে মিল্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নন। এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি দেশ ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক্ লাটিন ও ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে যান নাই। অথচ তিনি সেই বাল্যাবিস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চশাখার আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণ্যে শিক্ষাতরুর নিম্নশাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেমস্ মিলের ন্যায় সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে - কারণ জেমস্ মিল্ অপেক্ষা অধিকতর সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার লইতে দেখিতেছি। তবে কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র আর জগতে জন্মে নাই? তাহাও নহে – কারণ নিউটন্ প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবেন? আমরা এ বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল:—

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয় —অর্থাৎ ছাত্রগণের সাধারণ্যে যেরূপ বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি, যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়—শিক্ষক তাহারই অনুরূপ শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ছাত্রবিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের

উপযোগিনী নহে। এই জন্য বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং সময়ে উত্তম ও অধম সকল ছাত্রই সাকল্যে এক সমান হইয়া যায়। এই জন্যই বিদ্যালয়োত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য উপলব্ধি হয় না। প্রদীপ্ত প্রতিভাও যথোচিত সংমার্জনাভাবে ম্লান হয়, এবং সংরুদ্ধ প্রতিভাও অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্রগণের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এইরূপে সাধারণ শিক্ষা দ্বারা যদিও সাধারণ্যে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্তপ্রতিভ ছাত্রগণের যে ইহাদ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই যে এখানে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্প সময়ে অধিক শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা অনেক বিষয় বলপূর্ব্বক ছাত্রদিগের গলাধঃ করিয়া দেন। পরের গত, পরের মত, এবং পরবর্ত্তি ঘটনাবলীর সমষ্টি তাহাদিগের চিন্তা ও স্মরণশক্তিকে উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিষ্পেষিত করে। তাহারা নিজে কোন বিষয় ভাবিতে শিখে না। পরের মস্তিষ্কনিঃসৃষ্ট চিন্তা দ্বারাই আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর এই মহান্ দোষ অনেকেই উপলব্ধ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধান ঔষধি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করিলে, এই দোষের অনেক নিবারণ হয়

বটে, কিন্তু সেরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে। যাহা হউক আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবিনায়ক মিলের অদৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি এত অল্প বয়সে এত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিল্ বাল্য বয়সে পিতার নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করিয়া অদ্য আমরা তাঁহার জীবনের "বালকাণ্ড" সমাপ্ত করিব।

"পিতা শৈশবে আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, সে জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে, যে আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যে অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণাক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতিসিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলেরই উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই সে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমাদ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবের গুণে।

শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটী মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণশক্তির

সম্মার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই অগ্রে আমাকে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায়, আমার চিন্তাশক্তি অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

আত্মগরিমা বালপাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহায্যে অনেকের ভাবি উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আত্মোৎকর্ষসূচক তুলনা বা আত্মপ্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চভাব আমার মনে আসিতে পারিত না, বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত।

তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আমা-অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না, যে আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত, যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকবশতই কেবল সে রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখনও বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু উহা কখনও উদ্ধতও ছিল না। আমি কখনও চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই, যে আমি

এত বড়লোক বা এমন মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় ভাবিয়া থাকি সে এইমাত্র—যে আমি পঠনাদারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না। সুতরাং আমি পড়াশুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না।

আমি শৈশব হইতেই অত্যন্ত তার্কিক ছিলাম। এবং আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম। পিতা ও তাঁহার সমবয়স্ক ব্যক্তিগণ আমার শৈশবেও অতি গুরুতর বিষয়ে আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন, এবং এই জন্যই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই। দুঃখের বিষয় পিতা আমার এই কুঅভ্যাস ও দুর্বিনীততার সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয় তিনি উহা অবগত ছিলেন না। কারণ আমি তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতাম। এই জন্য তাঁহার সম্মুখে অতি শান্ত ও বিনীতভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকারচর্চা ও দুর্বিনীততার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহাহউক যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত অবাধাই বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রশ্রয়ান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ আত্মোৎকর্ষ বিষয়ক জ্ঞান কখনই আমার আত্মাকে অধিকার করিতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে দেশভ্রমণার্থ দীর্ঘকালের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে হাইডপার্ক

উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা আমায় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'তুমি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে—সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। সুতরাং অনেকেই তোমার এই উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে। এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। দেখিও যেন সেই সকল কথায় ও সেই সকল প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময় তোমার যেন মনে হয়, তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্য লক্ষ্মীর ন্যায়, সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্যবলে স্বয়ং তোমার শিক্ষাবিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হইয়াছ ইহা সেই সৌভাগ্যের ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে।' এই বাক্য গুলি অদ্যাপি যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই আমায় সর্ব্বপ্রথমে প্রতীত করে যে—আমার সমবয়স্ক যে সকল ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু

এই বোধ আমাব অন্তরে কোন প্রকাব আত্মাভিমান জন্মাইয়া দিল না। যত বারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, তত বারই আমার অন্তবে পিতার সেই বাক্য গুলি প্রতিধ্বনিত হইত।

সর উইলিয়ম হর্শেল।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর, তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্য্যাজীব ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও চারি সহোদরে উত্তরকালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত তাহাই শিক্ষা করেন। হর্শেলের অল্প বয়সেই বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকরসম্প্রদায়ে নিয়োজিত হইলেন এবং ১৭৫৭ অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ঐ সৈনিকদল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তিনি কতিপয় মাসান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু হর্শেল ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন্ সময়ে ও কি উপলক্ষে সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকর সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন তাহা বিজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাঁহাকে যে প্রথমতঃ কিয়ৎকাল দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় কাল-যাপন করিতে হইয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ অধিকাব না থাকাতে তাঁহার যে সকল বিষয়ে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহাব সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে অরল আব ডার্লিংটনেব অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হর্শেল এই কর্ম্ম সমাধা করিয়া ইয়র্কসবে তূর্য্যাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহন করেন, প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যাদিগকে উপদেশ দিতেন এবং দেবালয়সংক্রান্ত তূর্য্যাজীব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই কর্ম্মে জর্ম্মন জাতীয়েরা বিশেষ নিপুণ।

হর্শেল এবংবিধ অবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও আর আর চিন্তা একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয় কর্ম্মে অবসর পাইলেই, একচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয় সহকারে, ইংরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়েই এই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, যে উহা নিজ ব্যাবসায়িকী বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশেই, ডাক্তর রবার্ট স্মিথ রচিত তূর্য্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইংরেজী ভাষাতে তূর্য্যবিদ্যা

বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, স্মিথের পুস্তক তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবসায় পরিত্যাগের এবং ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, গণিতবিদ্যায় বুৎপন্ন না হইলে, ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবেক না। * অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন, যে অবসর পাইলে আর আর যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, সে সমুদায় এই অনুরোধে একবারেই পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে হর্শেল, বেট্‌স নামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্ট-রূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর সামান্যরূপ তূর্য্য কর্ম্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বাথ নামক নগরে গমন করেন। তথায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন দ্বারা শুশ্রূষুবর্গকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

তিনি এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। তদ্ব্যতিরিক্ত, রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্য্যপ্রয়োগ এবং শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদানাদির উত্তমরূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অর্থোপার্জ্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত,

তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে তাঁহার যেরূপ যত্ন ও অনুরাগ ছিল অর্থোপার্জ্জনে সেরূপ ছিল না। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়সংক্রান্ত কর্ম্মের বিলক্ষণ বাহুল্য হইয়া উঠিল। কিন্তু কর্ম্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার যে গাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রত্যহ তূর্য্যবিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন, কিন্তু তৎপরে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিত বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এইরূপে হর্শেল ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে তিনি অবকাশ কালে উক্ত বিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনো-নিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়া-ছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, কোন প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে, একটী দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনি-লেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায় অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে, তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি

যত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় অধিক হওয়াতে ক্রয় করিতে পারিলেন না, সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন। ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবল দূরবীক্ষণান্তর নির্ম্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রযত্নবৈফল্য দ্বারা তাঁহার উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্ত নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চর গ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত আবিক্রিয়া বিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে এই তার সূত্রপাত হইল। হর্শেল অতঃপর, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া সমধিক সময় লাভ বাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও স্বীয় ব্যাবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশকালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে অচির কালের মধ্যেই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুর নির্ম্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একটী দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন

দুই শত খান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিনক্লচিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুর নির্ম্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন তন্মাত্রই আহার হইত। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্রও ভঙ্গ দিলে সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। তিনি মুকুর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তদ্দ্বারাই লোকসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ং সময়ে স্বহস্তবিনির্ম্মিত এক অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতুপ্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে, উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল।

প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যাহা দেখিয়াছি ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্যাবেক্ষণ করাতে তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ ডাক্তার মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্যাবেক্ষণ করাতে এই ভ্রান্তি নিবারিত হইল। এবং তখন স্পষ্ট বোধ হইল যে ইহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠান-ভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্ব্বর্ত্তী *। তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন।

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা, আর সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য্য সকলের কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী, আর গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে, যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথানিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত উহাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, ইহা এক উপগ্রহ, পৃথিবীগ্রহের পরিপার্শ্বিক মাত্র। এক সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌর জগৎ হয়। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্য্যের

হর্শেল তাঁহার মর্য্যাদা নিমিত্ত তদীয় নামানুসারে স্বাবিস্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম সাইডস্ অর্থাৎ জর্জ নক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তর্বীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকে। তদনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিস্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম সাইডসের আবিক্রিয়া বার্ত্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কএক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথ নগরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল তদনুসারে ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উইণ্ডসর সন্নিহিত স্লোনামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনেই রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও নভোমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

ইতি পূর্ব্বে নূতন গ্রহের যে আবিক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত

আলোকপাতদ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। ইয়ুরোপীয় ইদানীন্তন কালীন জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

হইল তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের শেষে তিনি এই অতিবৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৭এ আগষ্ট, এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হয়। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে, কিন্তু প্রগাঢ়তরবুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ দূরবীক্ষণের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশ দিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনান্তর ঐ যন্ত্র দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে উহা স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপন করা গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘে পূর্ব্বযন্ত্রের অর্দ্ধেকের অধিক নহে।

কথিত আছে এই প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্, স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন, যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্যকালে কখনই শয্যারূঢ় থাকিতেন না, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ সমাধান

করিতেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের ভাব অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায় সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইটের পদ প্রদান করেন। হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্য্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন, কিন্তু বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্ব্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এইরূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। অনন্তর ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধন সম্পত্তির ন্যায় তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

———

আশা।

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধুপানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ নেশার নেশা ছুটিল না, একি দায়।

২

রে প্রমত্ত মন মম। কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কতদিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিবে ঝল ঝলে?
কেনা জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে:

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহাবে ?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহাবে,—
মাৎসর্য্য বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি ফল অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধুজলতলে
ফেলিস্, পামর।
ফিরে দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায়রে ভুলিবি কত,আশার কুহক ছলে।

জলপ্রপাত।

নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ না করিলে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য ও বিচিত্র কীর্ত্তি দৃষ্টি করা যায় না। জলপ্রপাত-রূপ অদ্ভুত ব্যাপার বোধ হয় এ দেশের প্রায় কোন ব্যক্তিই দৃষ্টি করেন নাই। নদী সমুদয় পর্ব্বতের উচ্চদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ে পতিত হয়। প্রথমতঃ কোন প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়, পরে অন্যান্য জলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতানুসারে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

কোনস্থানে দ্রুতবেগে গমন করে, কোথায় বা ভয়ানক আবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হয়, কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তী শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। যখন কোন নদী সম্মুখস্থ ও উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়, তখন তাহার জল সেই স্থানে একত্র হইয়া যে দিকের পর্ব্বত অল্প উচ্চ তাহাই উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রকাণ্ড জলরাশি প্রচণ্ডবেগে ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ একেবারে শত শত বা সহস্র সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে। তাহাকেই জলপ্রপাত বলে।

আশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চারিখণ্ডেই ভূরি ভূরি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে ইউরোপের অন্তঃপাতি স্থইজর্লণ্ড প্রদেশীয় জলপ্রপাত সকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তথায় ভূরিপ্রমাণ ভীষণাকার জলরাশি পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশ হইতে ভয়ঙ্কর বেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক একেবারে ১৫০০ কোথায়ও ২০০০ হস্ত নীচে পতিত হইতেছে। কিন্তু আমেরিকার জলপ্রপাত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

এই সমস্ত জলপ্রপাত দেখিতে অতি চমৎকার। আমেরিকা খণ্ডে নায়েগেরা নামে এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাত এক অদ্ভুত কাণ্ড। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি প্রচণ্ডবেগ, ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, প্রভূত ফেনরাশি ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই নদীর জল স্থানে স্থানে কোন কোন পর্ব্বতোপরি পতিত হইয়া এ প্রকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা দৃষ্টি করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এই জলপ্রপাতের এপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ যে তাহাতে কর্ণ

বধির হইয়া যায়, এবং তথায় এপ্রকার প্রচুর ফেনোৎপত্তি হয়, যে তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। কোন কোন দিন ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ দূর হইতে ইহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ফেনরাশি এত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, যে প্রায় ৩১ ক্রোশ তাহার বাষ্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই জলপ্রপাতের বৃর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে, "একেবারে এক সহস্র কামানে অগ্নি দিলে যে প্রকার ভয়ানক শব্দ ও প্রভূত ধূম উৎপন্ন হয়, এই জলপ্রপাত সেই প্রবাব গর্জ্জন ও বাষ্পোৎক্ষেপ করিয়া থাকে।" আব ঐ ফেনবাশিব উপরে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইনা যে প্রকাব অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করে, তাহা দৃষ্টি কবিলে মোহিত হইতে হয়। নভোমণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনুতে যত প্রকাব বর্ণ দেখা যায় ইহাতেও তাহাব সমুদায়ই দৃষ্ট হইবা থাকে।

এক পণ্ডিত গণনা কবিয়া দেখিয়াছিলেন, এই জলপ্রপাতে প্রতিপলে ২,১৪,৪৮,০০০ মণ জল পতিত হইবা থাকে। নানা স্থানেব জলপ্রপাতে যে সকল ফেন উৎপন্ন হয় তাহার নানা প্রকাব শোভা হইয়া থাকে। আমেরিকায মিসোরী নামে এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাতের দক্ষিণ ভাগ নিববচ্ছিন্ন শুভ্রাকার ফেনময়। সেই ফেনময ভাগের পরিসব প্রায় ৪০০ হস্ত। তাহার ফেন সমুদায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক প্রায় ১৩৫ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং উঠিতে উঠিতে সহস্র প্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিতেছে, ও তাহার উপরি ভাগে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নীল, লোহিত, পীতাদি রমণীয় বর্ণ সকল প্রকাশ করিতেছে। জগতে ইহা অপেক্ষা সুদৃশ্য বস্তু আর কি আছে?

বৃটন দেশীয় এক পর্য্যটক আমেরিকার পাসেক্ নামক নদের জলপ্রপাত দেখিতে গিয়া এক মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার ফেনের উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া অবিকল ইন্দ্রধনুর আকার উৎপন্ন হইয়াছে। গগনমণ্ডলে যেমন একখানি ইন্দ্রধনুর নীচে আর একখানি দৃষ্ট হয়, সে স্থানেও সেইরূপ দেখিলেন, এবং গগনমণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনু যেমন নানা বর্ণে বিভূষিত হয়, ঐ জলপ্রপাতের ইন্দ্রধনুও সেই-রূপ দৃষ্টি করিলেন।

এক এক নদীর দুই তিন জলপ্রপাতও থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে ডহাম প্রদেশের পশ্চিম ভাগে টিজ নামে এক নদী আছে। সেই নদী এক সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই প্রকাণ্ড জলপ্রপাত উৎপন্ন করিয়াছে, এবং সেই দুই জলপ্রপাত কিছুদূর পৃথক্ পৃথক্ পতিত হইয়া পরে পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রবলবেগে অবতীর্ণ হয়। এবং তাহার ফেন সমস্ত বহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে।

ভূমণ্ডলে শত শত জলপ্রপাত আছে। ভারতবর্ষেও হিমালয়ে ও বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে অনেক দৃষ্ট হইয়াছে। জলপ্রপাত কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার চক্ষে না দেখিলে তাহা সম্যক্‌রূপে অনুভব করা যায় না।

স্বাবলম্বন।

আমরা নিতান্ত নিরবলম্বন অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করি। বাল্যকালে মাতার যত্নে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হই। কিশোর বয়সে পিতার যত্নে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত ও শিক্ষিত হইয়া জ্ঞান লাভ করি। আবার যৌবনে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অপরের সহায়তার দিকে চাহিয়া থাকি। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে পুত্র কলত্রাদির গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া উঠি। ফলতঃ কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি বৃদ্ধ দশায় সকল সময়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী। এরূপ পরাবলম্বী জাতির স্বাবলম্বন শিক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ। অন্যের উপর নির্ভর করিয়া যে আমাদিগের কত শত বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নিরাশ্রয় অবস্থায় যদিও অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া থাকা যায় না, কিন্তু হস্তপদাদি কার্য্যক্ষম হইলে, এবং জ্ঞানের বিকাশ হইলে, পরাবলম্বী হইয়া থাকা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। কার্য্যক্ষম হস্তপদাদি আজীবন অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রাখিয়া যদি কেবল পরপিণ্ডে প্রাণ ধারণ করিতে হয়, তবে আর সে হস্তপদের প্রয়োজন কি? কোন ইংলণ্ডীয় কবি বলিয়াছেন, "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাদিগকে এরূপ দীর্ঘ হস্ত প্রদান করিয়াছেন, যে তাহা প্রসারিত করিলে স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে।" স্বর্গস্পর্শ হউক বা না হউক, অন্ততঃ হস্ত প্রসারণ করাও কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্য পদার্থের নিমিত্ত

চেষ্টা করা যদিও বিফল, কিন্তু অন্যের গলগ্রহ না হইয়া আমাদিগের স্ব স্ব শক্তি অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মন্দ নহে।

আত্মশক্তিপ্রয়োগ না করিয়া অনেকে দৈব অবলম্বন করেন। কর্দ্দমমগ্ন শকটচক্রে আপনার স্কন্ধারোপণ না করিয়া দেবতার নিকট সাহায্যার্থী হন। সাংসারিক ঘটনাস্রোতের অনুকূলে শরীর ঢালিয়া দিয়া, বিপত্তির ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে চলিতে থাকেন, কখনও বদ্ধপরিকর হইয়া প্রতিকূলে সন্তরণ বা ঝটিকামুখে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করেন না। কোন সুদৃঢ় হস্তে যদি তাঁহাদিগকে স্রোতের বিরুদ্ধে টানিয়া লয়, তাহা হইলেই উদ্ধার হন, নতুবা জড়বৎ কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে পরিশেষে অনন্ত কালসাগরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ পরপ্রত্যাশী মনুষ্য কখনই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, বরং উত্তরোত্তর অধঃপতিত হইতে থাকেন।

উন্নতিলিপ্সু যুবকগণ সর্ব্বাগ্রে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে বন্ধুগণের সদুপদেশে ঘৃণা, বা তাঁহাদিগের সহানুভূতিতে তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিবেন, তাহা নহে। তবে সহানুভূতি বা সদুপদেশ প্রাপ্তির আশায় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকা উচিত নহে। সংসারসমরাঙ্গণে স্বকীয় ভুজবল প্রদর্শন করিতে হইবে। বিচক্ষণ সেনাপতির আদেশানুবর্ত্তী, ও কার্য্যপটু সহচরগণে পরিবৃত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। "যাঁহারা আপনাকে সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের সহায় হন" এই উৎসাহপূর্ণ মহাবাক্য জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ করিবে।

জিগীষাই যুদ্ধপ্রবৃত্তির প্রধান লক্ষ্য। সাহসী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উন্নতিলাভের আশাতেই জীবনের মহাসমরে প্রবৃত্ত হন। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্রই যে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করা যায়, তাহা নহে, অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, শত শত অন্তরায় পরাভূত করিয়া, ধীর ও স্থিরভাবে প্রতি সোপানে পদার্পণ করতঃ ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পাঠ্যাবস্থায় অভিলাষ অতি উচ্চ থাকে। সেই উচ্চাভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সমাবেশ হওয়া উচিত। তাহা হইলেই বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়া যায়। আবার কায়মনোবাক্যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধিও দুরধিগম্য হয় না। সুখালোক উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে স্বার্থত্যাগী ও দূরদর্শী ব্যক্তি অভিলষিত প্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক অচল অধ্যবসায় সহকারে অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকেন, তিনি যথাকালে পূর্ণমনোরথ হইয়া সংসারে অতুল ঐশ্বর্য্য, অশেষ সম্মান ও অক্ষয় যশের অধিকারী হইতে পারেন। এবং "স্বনামা পুরুষোধন্যঃ" এই সাধুবাক্যের প্রমাণাস্পদ হইয়া জগতে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

যিনি সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সৌভাগ্যবান্ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে অবশ্যই আত্মনির্ভর করিতে হইবে, পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। দুর্ব্বল ও অশিক্ষিত হইলেও তুমি সহায়ের গুণে সৈনিক পদবীপ্রাপ্ত হইতে পার, কিন্তু সহায় বলে তোমাকে পরাভব হইতে রক্ষা করিবে না। তেজস্বী ঋষিবরের বরপ্রভাবে মূষিক সিংহাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল

বটে, কিন্তু আবার প্রভুর কোপে পতিত হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার মূষিকত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। যে পুরুষসিংহ স্বকীয় ক্ষমতা-প্রভাবে একবার সিংহপদবী লাভ করেন, কোন বিঘ্নবিপত্তিতেই তাঁহার সে সিংহত্বের বিলয় হয় না। তিনি আপনার বাহুবলকেই প্রধান বল মনে করেন, পরবলে বলশালী হওয়া অতিতুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন। তিনি পার্থবলে বলীয়ান্ হইয়া শিখণ্ডীর ন্যায় ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে চাহেন না, বরং স্বয়ংই পার্থ হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চাহেন।

সহায়তার বলে কখনই বড়লোক হওয়া যায় না। অন্তঃসার বিহীনের সহায়তার কোন ফল নাই। আবার সারবান্ ব্যক্তির সহায়তার কোন প্রয়োজন করে না। মনুষ্য স্বয়ংই স্ব স্ব ভাগ্য প্রবর্ত্তয়িতা। স্বাবলম্বন স্থির সৌভাগ্যের সোপান সদৃশ। এই স্বাবলম্বন বলে নিতান্ত হীনাবস্থা হইতেও সৌভাগ্যবান্ হওয়া যাইতে পারে। লর্ড টেণ্টারডেন দরিদ্র ক্ষৌরকারের পুত্র। তাঁহার পিতা প্রত্যেক ব্যক্তির শ্মশ্রুমুণ্ডনে এক পেনি এবং কেশ-কর্ত্তনে দুই পেনি করিয়া উপায় করিতেন। পুত্রকে সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখাইয়া ক্যাণ্টাববেরী গির্জার গায়কের পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু সহায়তার অভাবে টেণ্টারডেন সে পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সহায়তার বল তুচ্ছ করিয়া এক্ষণে টেণ্টারডেন স্বাবলম্বন করিলেন। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষার বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহারশাস্ত্র অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে বুদ্ধিমান, ও যশস্বী

ব্যবহাববিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করতঃ পরিশেষে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির পদে আরূঢ় হইলেন। অল্প কাল পরেই ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ তাঁহাকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করিলেন। কেবল আত্মনির্ভর করিয়া সামান্য ক্ষৌরকাবের পুত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ও প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

স্বাবলম্বনশীল ও পরিশ্রমী হইলেই যে ক্ষৌরকারের পুত্রমাত্রেই প্রধান বিচারপতি হইতে পারিবে তাহা নহে। তবে ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বুদ্ধিশক্তি ও অন্যান্য মানসিকবৃত্তি প্রদান করিযাছেন, তাহাকে তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। বুদ্ধি কার্য্যসাপেক্ষ। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই তদুপযোগিনী বুদ্ধিও স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি কার্য্যানুবর্ত্তিনী হইলেও অসাধ্যানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা মূর্খতার কার্য্য। স্বকীয় সামর্থ্যানুরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যদি স্বহস্তে উহা সম্পন্ন করা যায়, তবে অন্তরে কতই সুখশান্তির আবির্ভাব হয়।

চতুষ্কোণ পদার্থ যেমন গোলাকার বিবরে প্রবিষ্ট করান দুর্ঘট, আবার গোলাকাব পদার্থকে চতুষ্কোণ বিবরে প্রবিষ্ট করান যেরূপ দুঃসাধ্য, এক ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে ভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করান সেইরূপ দুঃসাধ্য। ধীরচেতাঃ, সরলবুদ্ধি, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সহায়বলে রাজার কুটিলবুদ্ধি সচীবের পদে আরোহিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু সে পদের গৌরবরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। স্বীয় ব্যবসায়ে থাকিয়া তদ্বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচালনা করতঃ পদোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলেই,

তিনি অবস্থার উন্নতি ও জনসমাজে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন। কর্ত্তব্যসাধন স্বাবলম্বনের প্রধান লক্ষ্য। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমাদের স্ব স্ব পদের দায়িত্ব আমরা নিজেই গ্রহণ করিব, এবং তদনুরূপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অপরের সাহায্যপ্রাপ্তি আশয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান না হইয়া সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্যসাধন করিলেই ভাগ্যলক্ষ্মী আপনিই তাহাকে আশ্রয় করেন।

আপনার যেরূপ সামর্থ্য ও বুদ্ধিশক্তি তদনুরূপ আত্মনির্ভর করিবে। আপনার পরিমাণ আপনি জানিবে। পরের প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া সামর্থের অতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। অথবা পরনিন্দায় বিমর্ষ হইয়া আত্মগ্লানি করিবে না। স্ব সম্ভ্রম-রক্ষা স্বাবলম্বনের প্রধান অঙ্গ। আপনার অবস্থা ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিলে, পৃথিবীশুদ্ধ লোকে তাচ্ছিল্য করিলেও অব্যাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা যায়। কবিবর মধুসূদন দত্ত যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নূতন বাঙ্গলা কবিতা লেখেন, তখন কত লোকে কত নিন্দা ও কত নিরুৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু দত্ত-কবি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। এক্ষণে তৎপ্রণীত অমিত্রাক্ষর-ছন্দোময় কাব্যগুলি শিক্ষিত সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডীয় কবি ওযার্ডস্ওয়ার্থের অদৃষ্টেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। তৎকৃত কাব্য জনসমাজে প্রচার হইবামাত্রই সমালোচকগণের তীব্র ও কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনে কবিতাগুলি নিতান্ত অসার বলিয়া সকলেরই ধারণা হইল। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল কবিতার রচনামাধুর্য্য ও ভাবলালিত্য পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল, এবং এক্ষণে উহা ইংলণ্ডের প্রত্যেক

গৃহে সাদরে গৃহীত, অধীত, ও প্রশংসিত হইতেছে। ফলতঃ যথার্থ গুণ কখনও চিরকাল অনাদরে থাকে না। বেকন বলেন—"আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-সম্ভ্রম থাকিলে লোকে স্ব-সংগৃহীত কূপোদক পানে, ও স্বোপার্জ্জিত শাকান্ন ভক্ষণে যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকে।" ফলতঃ অন্যের গলগ্রহ হইয়া বিলাসবাসনা পরিতৃপ্ত করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সামান্যভাবে জীবন যাপন করা শ্লাঘনীয়।

স্বাবলম্বনবলে মনুষ্যসমাজে গণ্য, মান্য ও যশস্বী হওয়া যায়। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। ভারতে এই পরাবলম্বী জাতির মধ্যেও যে সময়ে সময়ে স্বাধীনচেতাঃ আত্ম-নির্ভরক্ষম ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাবলম্বনের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাল্যজীবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কখনও তাঁহাকে পরপ্রত্যাশী হইতে হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে সন ১২২৭ (ইংরাজী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বড়বাজারে জগদ্দুর্ল্লভ সিংহের বাটীতে মাসিক ২৲ টাকা বেতনে বিল সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঠাকুরদাস অল্পকাল মধ্যেই আপনার কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে ১০৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে বেতন পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামস্থ পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া অধ্যয়ন করাইবেন

বলিয়া মনস্থ করিলেন। তদনুসারে নবমবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে সেই সুদূর বীরসিংহ পল্লীগ্রাম হইতে পদচারণে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। যে আত্মনির্ভর প্রভাবে বিদ্যাসাগর এতদূর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বাল্যজীবন হইতেই তাহার বিকাশ হয়। নবমবর্ষ বয়স্ক কোমলকায় শিশু বীরসিংহ হইতে বৈদ্যবাটী পর্য্যন্ত ২৩ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস সঙ্গে লোক আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হন নাই। দীর্ঘপথ পর্য্যটনে তাঁহার যার পর নাই ক্লেশ হইয়াছিল, এমন কি শেষ ৩।৪ ক্রোশ চলিতে পা বেদনাযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সেই বীরবালক আত্মনির্ভর পরিত্যাগ করেন নাই। পিতাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অতিকষ্টে বৈদ্যবাটী পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। পথে আসিবার কালে "মাইলষ্টোনে" অঙ্কপাত দেখিয়া ইংরেজী সংখ্যাগুলি আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে পরিশেষে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, এই তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইল।

কলিকাতায় আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বুদ্ধিশক্তির প্রাখর্য্য, অধ্যবসায়ের অচঞ্চলতা ও যত্নের আগ্রহাতিশয়তায় তিনি যাণ্মাসিক পরীক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে প্রথমস্থানীয় হইয়া বৃত্তি পাইলেন। এইরূপে বর্ষদ্বয়ে ব্যাকরণ সমাধা করিয়া আর দশবৎসর মধ্যেই স্বকীয় অমানুষী প্রতিভা প্রভাবে সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন, ও স্মৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের অধ্যাপক বিদ্বমণ্ডলী প্রদত্ত "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এ কথা বলা বাহুল্য

যে প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থানীয় হইয়াছিলেন। অধ্যাপকগণ তাঁহাকে অসাধারণ ধারণাশক্তিসম্পন্ন ও মেধাবী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে পুত্রবৎ বাৎসল্য করিতে লাগিলেন। গুণবান্ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকগণ স্বভাবতঃই স্নেহপরতন্ত্র হইয়া থাকেন। শত শত শিক্ষার্থী রাজপুত্র সত্বেও দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি অধিকতর স্নেহবান্ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে যে তাঁহার শিক্ষকগণ স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, তাহার বিচিত্র কি? অধ্যয়নকালে সংস্কৃতে রচনা লিখিয়া তিনি দুইবার ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "সত্যকথনমহিমা" প্রথম বারের রচনার বিষয় ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রচনাসম্বন্ধে আপনার অনুপযুক্ততা মনে করিয়া পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন নাই, অন্যত্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রাধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলপূর্ব্বক পরীক্ষাগৃহে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লেখনী হস্তে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "যা পার তাই লেখ।" ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "কি লিখিব"? শিক্ষক বলিলেন—"সত্যং হি নাম পরমো ধর্ম্মঃ" এই বলিয়া আরম্ভ কর। ঈশ্বরচন্দ্র এই বাক্যটী লিখিলেন। অমনি ওজস্বী প্রতিভাস্রোত তীব্রবেগে ছুটিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে ভাবের পারিপাট্য, যথাযথ শব্দের আবির্ভাব ও নব নব যুক্তির উন্মেষ, হইতে লাগিল। লেখনী বিদ্যুৎবেগে চলিল। অল্প সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র একটী সুদীর্ঘ রচনা লিখিয়া পরীক্ষাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রচনা পরীক্ষিত হইল, ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

পুরুষপরম্পরা অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া ঠাকুরদাস ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে টোল করিয়া নিকটবর্ত্তী বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবেন। তজ্জন্য সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোন ভাষা এ যাবৎ তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। এই সময়ে দেশীয় লোকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত হেয়ার, ও ডাফ্ প্রভৃতি মহামনাঃ ইংরেজগণ কর্তৃক হিন্দুকলেজ, ও ডাফ্ কলেজ সংস্থাপিত হয়। বিখ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, ও দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া জনসমাজে অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমবন্ধু ছিলেন। ইহাদিগের উপদেশে তিনি ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এবং অল্প দিন মধ্যে পূর্ব্বজন্মশিক্ষিত বিদ্যার ন্যায় ঐ বিজাতীয় ভাষাতেও তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষাতেও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিলেন। পাঠদ্দশায়ও ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ স্বাবলম্বন গুণ ছিল। আধুনিক ছাত্রগণ যেরূপ পরাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছেন, পূর্ব্বকালে ছাত্রেরা সেরূপ ছিলেন না। শুনিতে পাই ভূটান প্রদেশে বিদেশীয়কে কোন একটা নদী পার হইতে হইলে, তদ্দেশবাসী লোকেরা তাঁহাকে ঝুড়ির ভিতর বসাইয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক নদীর উপরিস্থিত কাষ্ঠসেতু পার হইয়া যায়। বিদেশীয় ব্যক্তি সাহস করিয়া স্বয়ং পার হইতে পারেন না। অধুনাতন শিক্ষাপ্রণালীও সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পাঠার্থিগণ স্বাবলম্বন না করিয়া শিক্ষকের পৃষ্ঠাবলম্বন পূর্ব্বক দুস্তর বিদ্যাতরঙ্গিণী

পার হইয়া যান। সাহিত্যের টীকা টিপ্পনী, ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার, গণিতের সমাধান, ছাত্রগণের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে। বুদ্ধিপরিচালন অথবা পরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহারা মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন, অথবা দুর্ব্বোধ্য স্থল সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন না। শিক্ষক যাহা লিখিয়া দেন, অথবা অর্থ পুস্তকে যাহা লিখিত থাকে, শারিকার "রাধাকৃষ্ণ" বলার ন্যায় তাহাই কণ্ঠস্থ করেন, যথার্থ ভাব বা অর্থ অল্পই বুঝিতে পারেন। দুর্ব্বোধ্য বিষয় আয়ত্ত করা অতি কষ্টকর ব্যাপার। তথাপি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, রোগীর নিম্ব-ভক্ষণের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অতি কষ্টে সেই সমস্ত বিষয় গলাধঃকরণ করেন, এবং পরীক্ষাগৃহে তৎ সমুদায় যথাবৎ উদ্গীরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কৃত্রিম উপায়লব্ধ-বিদ্যারও পর্য্যবসান হয়। ছাত্রগণের আত্মনির্ভর অভাবেই এইরূপ শোচনীয় ফল প্রসূত হইয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন স্বাবলম্বনের আদর্শ। বিদ্যালয়ে যে পাঠ গ্রহণ করিতেন, গৃহে আসিয়া আপনার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পরিচালনপূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাহা বুঝিতেন। একটী শ্লোকের অর্থ বুঝিবার নিমিত্ত সমস্ত রাত্রি ভাবিয়াছিলেন, পরিশেষে প্রত্যূষে তাহার অর্থ-সঙ্গতি করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠায় বিশদভাষায় লিখিয়া রাখিলেন। পাঠশিক্ষার নিমিত্ত তিনি অনেক সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। কোন স্থল বুঝিতে না পারিলে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন না। স্বকীয় বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রভাবে তত্তৎ স্থলের যে অর্থ করিতেন, তাহা এমন সুমধুর, এমন ভাবপূর্ণ, ও এমন

পরিস্ফুটিত, যে তাহাতে তাঁহার অধ্যাপকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। পাঠ্যাবস্থায় এরূপ আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এত অল্পদিনে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল যে পাঠ বিষয়ে তিনি পরাবলম্বীছিলেন না, তাহা নহে। এই সময়ে স্বহস্তে বাজার করিতেন, রন্ধন করিতেন, এবং বাসার অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া স্বয়ং আহার করিতেন। বাসায় দাস দাসী কেহই ছিল না। তিনি স্বহস্তেই উচ্ছিষ্ট স্থান পবিস্কৃত ও বাসনাদি ধৌত কবিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কি অতুলনীয় ত্যাগস্বীকারের উদাহরণ স্থল।

অনন্তর ঈশ্বরচন্দ্র কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন। সংস্কৃত কলেজে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই স্বকার বিদ্যা ও বুদ্ধি এবং সুশিক্ষাদানপ্রভাবে ছাত্রগণের ভক্তিভাজন ও কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কলেজে সাহিত্য-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। ঐ পদের মাসিক বেতন ৯০৲ টাকা। কলেজের সম্পাদক মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদপ্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে উক্তপদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। মার্শেল সাহেব ও তদানীন্তন কর্তৃপক্ষগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ স্বার্থত্যাগ ও উদারভাব দর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। বন্ধুপ্রিয়তা তাঁহার এইরূপ অমানুষই ছিল। বন্ধুগণের মঙ্গল ও তাঁহাদিগের বিপদুদ্ধারজন্য তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় ও আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান লেখকের পদে ৮০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দিয়া যখন অধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইল, তখন তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে এই নবপ্রতিষ্ঠিত অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া এই পদেব বেতন ৫০০৲ টাকা হইল। কলেজে কর্ম্ম করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক শুভকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কবিতে পাইত না। তিনি এই নিয়ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সমস্ত হিন্দু সন্তানকে অধ্যয়নার্থ অবাধে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন, তাহাতে সবকারি সাহায্য দান, বালিকা বিদ্যালয়ের বিস্তার, বেথুন কলেজের আরম্ভ—এ সমস্তই তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় সূচিত ও আরব্ধ হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা প্রথাও তিনিই প্রবর্ত্তিত কবেন।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মত্যাগ আত্মসম্ভ্রমরক্ষার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আত্মগৌবব রক্ষাব নিমিত্ত, পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত কতদূর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যত্যাগে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া লিখিতে হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়া উঠে। সুতরাং আমবা সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব মাত্র। এই সময়ে অল্পবয়স্ক তরলমতি ইয়ং সাহেব শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন, ও প্রতিষ্ঠাপন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্তর এবং

ক্রমশঃ মনান্তর হইতে লাগিল। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরক্তি জন্মিল। এই বিরাগতুষানল প্রজ্বলিত হইবার আর একটী কারণ উপস্থিত হইল। নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলার মডেলস্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের পদ শূন্য হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। কিন্তু তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু হইলেও স্বজাতি পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) অধস্তন কর্ম্মচারী লজ্ সাহেবকে উক্ত পদে নির্ব্বাচন করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যপরিত্যাগ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে কার্য্যপরিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল না। আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা অবলীলা ক্রমে ৫০০৲ টাকার চাকরী পরিত্যাগ করিলেন। স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ এত দিন যে সামান্য বন্ধনে আবদ্ধছিলেন, তাহা ছিন্ন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে লোক হিতব্রতে রত হইলেন।

প্রথম ব্রত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষাকে যে পরিমার্জ্জিত ও নবপরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিতে পাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রবর্ত্তক। বর্ণপরিচয়ে "ক, খ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বেতালপঞ্চবিংশতি" "সীতার বনবাস," পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার উচ্চতম সাহিত্য সমস্তই তাঁহার রচিত। কেবল তাঁহার প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলেই বাঙ্গালা ভাষায় সুবিজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষারও সুগম পথ তিনিই

আবিষ্কৃত করেন। তৎপ্রণীত কয়েক খণ্ড ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ অধ্যয়ন করিলেই সংস্কৃত ভাষার একরূপ সংস্কার জন্মে।

দ্বিতীয় ব্রত সমাজ সংস্কার। বালবিধবাগণের দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি তাহাদিগকে বালবৈধব্য-যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত পরাশরসংহিতা লিখিত বিধবা বিবাহ প্রতিপোষক বিধি দ্বারা উহার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় বচন, ও অকাট্য যুক্তি প্রভাবে সে প্রতিবাদ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। সাহসী বীর পুরুষ সমাজসংস্কারের মহা সমরে জয়লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন। বহুবিবাহ নিষেধ পক্ষেও তিনি যথোচিত যত্ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত যুক্তি সমাহার পূর্ব্বক প্রতিপক্ষগণের মত খণ্ডন করতঃ বহুবিবাহ যে দোষাবহ, তাহা যথাবিধি প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ফলতঃ সমাজসংস্কারে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বা অর্থব্যয়ে যতদূর সম্ভব, তাহার কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই।

বিদ্যাসাগর আবার দয়ার সাগর। অপরের চক্ষে জলধারা পতিত হইতে দেখিলেই তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতেন না। বিষণ্ণবদনে ও সাশ্রু-নয়নে যাচ্ঞা করিলেই যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তিনি সতত্তই মুক্তহস্ত ছিলেন। ধনবান্ কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি মূর্খ, হিন্দু কি ম্লেচ্ছ, তাঁহার নিকট প্রার্থী হইলে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এরূপ সার্ব্বলৌকিক বদান্যতা মনুষ্যে সম্ভবে না।

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের সময় হইতেই অযথা পরিশ্রমে ঈশ্বর-চন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই অম্লরোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে ১২৯৫ সালে তাঁহার পতিপরায়ণা পত্নীর মৃত্যু হইল। রোগাক্রান্ত দেহ, পত্নীবিয়োগদুঃখে দিন দিন অধিকতর ক্ষীণ হইতে লাগিল। পর বৎসর ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় ঈশ্বরচন্দ্র নবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে গমন করিলেন। ভার-তের তমসাচ্ছন্ন আকাশে যে তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্র উদিত হইয়া অন্ধকার রাশি বিদূরিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা চির দিনের নিমিত্ত বিলীন হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র স্বাবলম্বনশীল হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অবিদ্বানের পুত্র পণ্ডিত হইলে, দরিদ্রের পুত্র ধনবান হইলে, জগৎকে তৃণেবজ্ঞায় জ্ঞান করে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। দীনহীন ভিক্ষাজীবী দরিদ্রকেও তিনি যে চক্ষে দেখিতেন, অতুল প্রতাপ নর-পতিকেও তিনি সেই চক্ষেই দেখিতেন। আত্মশক্তিতে তাঁহার যথোচিত বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই সকলকাম হইয়াছেন। তিনি রন্ধনগৃহে বিচক্ষণ সুপকার, বিদ্যালয়ে আদর্শছাত্র, শিক্ষামঞ্চে সুদক্ষ অধ্যাপক, সংস্কারসমরে অজেয় সেনাপতি, রাজসমীপে স্পষ্টবাদী উপদেষ্টা, এবং করুণাক্ষেত্রে অকাতর দানশীল ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় অমূল্যরত্ন গর্ভে ধারণ করেন বলিয়াই ভারত রত্নগর্ভা হইয়াছেন।

কোকিল।

-○০○-

১

বসন্তের চিরসঙ্গী হে বিহঙ্গবর!
নিকুঞ্জকানন-মাঝে, নূতন অতিথি সাজে
উদয় তোমার;
নবীন পল্লব-ফুল-ফলে,
তব গৃহ অতি কুতূহলে
সাজান প্রকৃতি দেবী কিবা মনোহর!
বিহঙ্গ সঙ্গীতে করে তব সমাদর।

২

অমল মল্লিকা ফুলে শ্যামল প্রান্তরে
সুশোভিত করে যবে; তোমার পঞ্চম রবে,
শ্রবণ বিবরে
ঢালে যেন সুধাময় ধারা।
আছে কিহে হেন ধ্রুব তারা
দেখাইতে পথ তব? প্রতি সম্বৎসরে
শীতান্তে বসন্তোদয় কে বলে তোমারে?

৩

চির সুখী তুমি পাখি! তোমার সহায়,
অহে কুলবালাপরা ঋতুরাজ, এবে ধরা
হলেন উদয়।

তোমা সহ ঋতুকুলেশ্বরে,
বন্দি তাই সানন্দঅন্তরে,
লতাকুঞ্জে কলকণ্ঠ-বিহঙ্গ-নিচয়-
ললিত-সঙ্গীত শুনি, জুড়াই হৃদয়।

৪

বসি বকুলের মূলে বিমুগ্ধঅন্তরে,
কুসুমকোমলা বালা গাঁথি বকুলের মালা
খোপা ঘেরি পরে।
হেন কালে সুপ্তবনভূমি
জাগাইলে কুহরবে তুমি,
শুনিয়া তোমার সেই কুহু কুহু স্বরে,
অমনি সরলা বালা কুহু কুহু করে।

৫

যবে বনস্থলীমাঝে অশোক বিকাশে,
বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে, তুমিও পালাও রঙ্গে
ভিন্ন ভিন্ন দেশে;
উড়ি যাও, আকাশ ভরিয়া
সুস্বরলহরী ছড়াইয়া,
নবীন অতিথি বেশে সুখের আবাসে,
নবাগত ঋতুরাজে ভেটিবার আশে।

৬

তোমার নিকুঞ্জগৃহ সতত শ্যামল।
তোমার আকাশতলে আবরে না মেঘদলে,
(চিরনিরমল)।

তব গানে নাই সমাবেশ
মর্ম্মভেদী দুঃখকথালেশ,
তব বর্ষে বর্ষা কভু নাহি ঢালে জল,
উগারে না কভু শীত হিমানী গরল।

৭

হায়! যদি পক্ষ-পুট দিতেন ঈশ্বর,
তোমা পিক! সঙ্গে লয়ে, গগনে উধাও হয়ে,
দেশ দেশান্তর
ভ্রমিতাম মনের হরষে,
নব নব বরসে বরষে
হইতাম বসন্তের চির অনুচর,
লভিতাম চিত্তে কত প্রমোদ অপার।

জীবন চরিত ও ইতিহাস পাঠের উপকারিতা।

মানব জগৎ বৈচিত্রের রঙ্গভূমি। শারীরিক গঠনের বৈষাদৃশ্যমাত্র যে কেবল মানবমণ্ডলীতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা নহে; আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহেরও বৈষম্যভাব প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও বা স্মৃতিশক্তি সাতিশয় তেজস্বিনী, কেহ বা পুনঃ পুনঃ কোন বিষয় শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিয়াও স্মরণ রাখিতে পারেন না। কাহারও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতি দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ে সহসা প্রবেশ লাভে সক্ষম; আবার কেহ নিতান্ত সরল

বিষয়ও বারম্বার চেষ্টা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কেহ বা কারুণ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য কীটকেও চরণতাড়না করিতে কুণ্ঠিত হন; আবার সহস্র নরহত্যা করিয়াও কোন কঠোর-হৃদয় দস্যুর চিত্ত বিচলিত হয় না। আন্তরিক বৃত্তিনিচয়ের এববিধ বৈষম্য নিবন্ধন, কেহ বা ধরাধামে পূজনীয়, কেহ বা ঘৃণার্হ হইয়াছেন। যাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি সুতীক্ষ্ণ, যাঁহারা কারুণ্যরত্নাকর, যাঁহাদের চিত্ত ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, নিঃস্বার্থ পরোপকারে যাঁহারা আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত, সেই মহামনাঃ দেবস্বভাব নরগণ জগতের যথার্থ উপকারী। জীবনচরিতে এই সমস্ত মহাত্মাগণের চরিত্রই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। জীবনচরিত পাঠে আমরা জানিতে পাই যে, কোন সদয়হৃদয় ধর্ম্মবীর কিশোর বয়সে দারাপুত্র ও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া চীবরবাসপরিধায়ী ভিক্ষুকবেশে নবধর্ম্মপ্রচারপূর্ব্বক ধর্ম্মজগতে মহান্ বিপ্লব উৎপাদন করিয়াছেন। কোন অধ্যবসায়শীল রণবীর লেখনী পরীহার পূর্ব্বক তরবারি ধারণ করতঃ সুদূরদেশে স্বজাতীয়গণের নব রাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি প্রোথিত করিয়াছেন। কেহ বা অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মহান্ সাম্রাজ্যের মন্ত্রিত্বপদ অধিকার করতঃ পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবকের ন্যায় মহোৎসাহে ও অক্লিষ্টপরিশ্রমে দুরবগাহ রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব সমুদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কেহ বা সুরস সাহিত্যক্ষেত্র কর্ষণ করতঃ তন্মধ্যস্থ রত্নরাজি নিষ্কাশিত করিয়া জগতে কত শত চুর্ন্তভয়ের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। আবার কত শত মহাত্মা কল্পনার ঐন্দ্রজালিকমন্ত্রপ্রভাবে দ্যুলোকের বিষয় ভূলোকে আনয়ন পূর্ব্বক, সুললিত ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিয়া সুমধুর বীণা ঝঙ্কারে চিত্ত

চমৎকৃত, উল্লসিত ও আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়াছেন। এই সমস্ত মহামনাঃ ব্যক্তিগণের জীবনে যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, অন্তরে কখন বা ভীতি, কখন বা বিস্ময়, কখন বা উৎসাহ, কখনও বা উল্লাসের আবির্ভাব হয়।

নিবিষ্টচিত্তে জীবনচরিত পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যে মহাত্মার জীবনচরিত পঠিত হইতেছে, তিনি যেন সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ যেন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। অভিন্নহৃদয় সহচরের ন্যায় যেন তিনি পার্শ্বেই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার গুণগ্রাম আমরা তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কখন বা তাঁহার কারুণ্য গুণের পক্ষপাতি হইতেছি; কখন বা তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতেছি; কখন বা তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিভাপ্রভায় চমকিত হইতেছি; আবার কখন বা জলদগম্ভীরনাদিনী বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইতেছি। এবম্বিধ ব্যক্তিকে নিত্যসহচর পাইয়া তাঁহার গুণের অনুকরণ করিতে কার না ইচ্ছা হয়? সকলেই সদ্‌গুণের পক্ষপাতী, সকলেই সদ্‌গুণের অনুচিকীর্ষু। কি উপায়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এরূপ উপদেশ অনেকের নিকট পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী দৃষ্টান্ত কার্য্যকারী। অন্যান্য পুস্তকপাঠে উপদেশ মাত্র লাভ হয়। জীবনচরিত পাঠে জীবন্ত দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। কি উপায়ে সংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, জীবনচরিত অধ্যয়নে তাহার পথ যেরূপ সহজে লক্ষিত হইবে, অন্যান্য গ্রন্থপাঠে সহসা সেরূপ হওয়া দুর্ঘট।

জীবনচরিত অধ্যয়ন মাত্রেই যে সংসারে অসাধারণ গুণশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হওয়া যায়, তাহা নহে। যে যে ব্যক্তির জীবনচরিত অধ্যয়ন করা যাইবে, তাঁহারা যে যে গুণবত্তাহেতু নরসমাজে স্মরণীয়কীর্ত্তি হইয়াছেন, যথাযথনিয়মে সেই সেই গুণের অনুসরণ করিলেই, হয়ত কালক্রমে আমরাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইতে পারিব। মহাত্মাগণের গুণেরই অনুকরণ করিতে হইবে, তাঁহাদের দোষ অবশ্য আমাদিগের অনুকরণীয় নহে। মনুষ্য ভ্রমাত্মক জীব। সহস্র মহনীয়গুণে অলঙ্কৃত ও মানবমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইলেও কেহ ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহেন। নির্দ্দোষিতা মানবে লক্ষিত হয় না। তবে কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, যে, কোন কোন মহাপুরুষের দূষণীয় স্বভাবই তাঁহার উন্নতির কারণ। মহাকবি কালিদাস আরূঢ় শাখার মূলদেশকর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনার মূর্খত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই, সেই সময় হইতে তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হইল। বিখ্যাত দৃশ্যকাব্যরচয়িতা শেক্ষপীয়র যদি লুইসপার্ক হইতে হরিণাপহরণ অপরাধের দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া লণ্ডন নগরে পলাইয়া না আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভাশিখা কখনই দীপ্তিমতী হইত না। দুঃসাহসিকতা মহাবীর ক্লাইবের উন্নতির সোপান।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন কোন মহাত্মার দোষও গুণের কারণ হয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া মহাত্মাগণের দোষ গুণ উভয়েরই যে আমরা অনুকরণ করিব তাহা নহে। দোষ পরীহার পূর্ব্বক গুণগ্রহণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। জীবনচরিত পাঠে উপকারিতা লাভ

করিতে হইলে, পুস্তকে বর্ণিত মহামনাঃ ব্যক্তিগণের সদ্গুণ-রাশির অনুকরণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই অভিলষিত ফল লাভে সমর্থ হইয়া জনসমাজে মাননীয় ও গণনীয় হওয়া যাইবে।

খ্যাতনামা পুরাকালীন ব্যক্তিগণ সময়ের সৈকতপুলিনে যে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন; সংসারসাগরের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে বিতাড়িত ও দিগ্‌ভ্রান্ত কোন হতভাগ্য, সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করতঃ কূলপ্রাপ্ত ও সাহস সহকারে ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ইতিহাস অতীতের সাক্ষী। পূর্ব্বকালে যে সমস্ত জাতি অতি হীনাবস্থা হইতে উন্নত হইয়াছেন, আবার যাঁহারা উন্নত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উন্নতি ও অবনতির বিষয় ইহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইতিহাসপাঠ অতীব চিত্তরঞ্জক, ও কৌতূহলোদ্দীপক। ইতিহাসপাঠে আমরা জানিতে পাই, যে জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ অতীত কালে কিরূপ ঘটনাস্রোতে নিপতিত হইয়া কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তত্তৎ ঘটনায় নিপতিত হইলে, কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ কালে কি অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। অতএব যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করা যায়, ইতিহাস আমাদিগকে সেই সমস্ত উপায়ের অনুসরণ করিতে শিক্ষা দেয়। পুরাবৃত্ত অধ্যয়নে আমরা জানিতে পাই, সপ্তশৈলোপরিস্থিত রোমনগর প্রথমতঃ কতকগুলি পলায়িত যাযাবর দস্যু কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়; এবং কালক্রমে সেই রোমনগর

তৎকালপরিজ্ঞাতপৃথিবীর সার্ব্বভৌম রাজধানী হইয়া ছিল। পারস্যরাজ ডেরায়স্ ও জরক্সিস্ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হইয়া গ্রীকেরা রণতরি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বদেশীয় উপকূলভাগ রক্ষা করিতে শিক্ষা করিল, এবং সেই উন্নতির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক জাতি এক সময়ে অসাধারণ শৌর্য্যশালী ও জ্ঞানবান্ বলিয়া ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। পুরাতন টায়র নগরী হইতে পলায়িত মুষ্টিমেয় লোক কর্ত্তৃক কার্থেজ রাজ্য অধিষ্ঠাপিত হয়, পরিশেষে হানিবলপ্রমুখবীরগণ-পবিত্রীকৃত সেই কার্থেজের দুর্দ্দমনীয় ভুজবলপ্রভাবে, জগজ্জয়িনী রোমনগরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। যে ইংরেজ-জাতি আজকাল জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, প্রাচীন কালে সেই জাতি নিউজিলাণ্ডবাসী বর্ব্বর জাতি অপেক্ষাও অসভ্য অবস্থায় ছিলেন। তাঁহারা আমমাংস ভক্ষণ, গিরিগহ্বরে বাস, ও বিবস্ত্র দেহ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত করিতেন। ইতিহাসে আরও আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ঐকমত্য অবলম্বন করিলে, অভিলষিত লাভে সমর্থ হওয়া যায়। রোমের প্লিবীয় সম্প্রদায় এক সময়ে নগরপ্রান্তবাসী কৃতদাসের ন্যায় ছিল; ক্রমশঃ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা গোত্রসম্ভূত পেট্রিসীয় দলের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহারা রোমীয় সাধারণতন্ত্রের মস্তকস্থানীয় হইয়াছিল। সাইমন শুভক্ষণে ইংলণ্ডবাসী নাগরিক সম্প্রদায়কে মহাসভায় প্রবেশিত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহারা ক্রমশঃ বলীয়ান্ ও তেজস্বী হইয়া এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, যে ইংলণ্ডের কোন অত্যাচারী নরপতি তাহা-দিগের দ্বারা বিচারিত হইয়া ছিন্নশীর্ষ হইয়াছিলেন। এক্ষণ-

সেই মহাসভায় সম্ভ্রান্তগণ অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক ও ক্ষমতাও প্রভূত।

ইতিহাস পাঠে ইহাও শিক্ষা পাওয়া যায়, যে যাহাদিগকে নিতান্ত হেয় ও অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া অনবরত পদদলিত ও উৎপীড়িত করা যায়, কালক্রমে তাহারাই আবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পদদলনকারিদিগের যথোচিত শাস্তি বিধান করে। প্রভুশক্তির অপব্যবহারে'যে কি ভয়ানক বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, ইতিহাসে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই, ও পঞ্চদশ লুই প্রজাপুঞ্জের উপর যথেচ্ছাচার প্রভুশক্তির প্রয়োগ করিতেন। অত্যাচারে পুনঃ পুনঃ প্রপীড়িত হইয়া সেই সময় হইতেই প্রজাগণের অন্তরে বৈরনির্য্যাতন সংকল্পের সূত্রপাত হইল। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাদের হৃদয়-চুল্লিতে ক্রমশঃ প্রধূমিত হইয়া পরিশেষে ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে কি বিভীষিকাময়ী অত্যদ্ভুতঅনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল! পারী নগরীর রাজপথ শোণিত-স্রোতে পরিপ্লুত হইল; নৃপ দম্পতির শিরশ্ছেদ হইল, সমগ্র ইউরোপবাসী ভীতিসংক্ষুব্ধ ও উৎকণ্ঠাবিচলিত হইয়া উঠিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীর উৎখাত হইয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইল। রাজা অত্যাচারী হইলে পরিণাম এইরূপ শোচনীয়ই হইয়া থাকে। "অতি সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে সম্বদ্ধ ধর্ম্ম-অসি সাম্রাজ্যের ঊর্দ্ধদেশে লম্বমান রহিয়াছে। সূত্র ছিন্ন হইবা মাত্র সেই শাণিত অসিপত্র রাজ্যোপরি নিপতিত হইয়া রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিবে"—ন্যায়মার্গবিচলিত নরপতিগণকে ইতিহাসে এই উপদেশ প্রদান করিতেছে।

বিলাসপরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা জাতি সমূহের ধ্বংসের মূল। দীর্ঘকাল স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যে জাতি ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া উঠে, পরের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া কেবল আত্মসুখে রত হয়, বিনাশ তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী। এক সময়ে রোম রাজ্যের বিপুল প্রতাপে সমগ্র ইউরোপ কম্পিত হইয়াছিল; রোমের বিজয়-পতাকা আফ্রিকার তীর ভূমিতে উড্ডীন হইয়াছিল; ধনে, মানে, গৌরবে রোম সর্ব্বোপরি গণনীয় হইয়াছিল। কিন্তু যখন রোমসন্তান বিলাসিতার দাস ও যথেচ্ছাচারের আজ্ঞাবহ হইয়া উঠিল, তখনই অতি হীন ও নিকৃষ্ট জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ভারতে মুসলমান রাজ্য বিলোপের কারণ কি? আরাঞ্জিবের পরবর্ত্তী সম্রাটগণ যার পর নাই বিলাসী হইয়া উঠিলেন, দিবারাত্র রমণীমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, নৃত্যগীতে আমোদিত ও আসবপানে উন্মত্ত থাকিতেন, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেন না। সুতরাং এই অরাজকতার সময়ে, কি মুসলমান কি হিন্দু প্রধান প্রধান সচিবগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত করিতে লাগিলেন। ইহাদিগেরও পরস্পরে মনোমালিন্ত ঘটিল ও ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। সুদূরদ্বীপবাসী, দূরদর্শী ইংরেজগণ বণিক্‌বেশে অনেক দিন হইতেই ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। দেশের এইরূপ দুরবস্থাদর্শনে তাঁহাদের অন্তরে রাজ্যস্থাপনের ইচ্ছা সমুদিত হইল। চতুর ও অধ্যবসায়শীল ইংরেজ বিবাদমান দলের একপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহায়তায় অপরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিতে লাগিলেন। মুসলমান সম্রাট তাহাদিগের

বৃত্তিভোগী হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে কালক্রমে সম্রাটের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ইংরেজের কেশরিচিহ্নিত জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে। ইতিহাসে এইরূপে জাতি বিশেষের অভ্যুদয় ও বিপ্রলয় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

সন্ধি, বিগ্রহ, অভিযান, সন্নিবেশ, অবরোধ প্রভৃতির বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ইতিহাস পাঠের চরম উদ্দেশ্য নহে। কিরূপে জাতিবিশেষের উন্নতি বা অধঃপতন হইল, কিরূপে শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল, কিরূপে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া দেশের শোচনীয় বা শুভকর অবস্থা সংঘটিত করিল, সুরাজার শাসনগুণে কিরূপে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইল, আবার কুরাজার শাসনদোষে কিরূপেই বা দেশ দুর্ভাগ্যবান হইয়া উঠিল, এই সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাই ইতিহাস পাঠের প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, ভূয়োদর্শন জন্মে, তর্কশক্তি বিস্তৃতি লাভ করে, ও বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া সৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করায়। সুতরাং ইতিহাস পাঠ ক্লেশদায়ক বা বিরক্তিকর না হইয়া বরং সুখপাঠ্য ও কৌতূহলজনক হইয়া থাকে।

ঈশানীমন্দির।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দির ছিল। অনতি উচ্চ একটী

পর্ব্বত শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরসম্মুখে প্রস্তররাশি সোপান রূপে খোদিত ছিল। নীচে একটী পর্ব্বততরঙ্গিনী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা করিত। অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রী সংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠ দেশ বহু পুরাতন বৃক্ষদ্বারা আবৃত। চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত। সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানীমন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই, বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যাকাণ্ডে মহারাষ্ট্র দেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই সেই ক্ষুদ্র শান্ত পর্ব্বত-মন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী একপ্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ পূর্ণ! প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দ্রুতবেগে এদিক ওদিক্ পদচারণ করিতেছিলেন, ক্ষণেক বা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না; ভ্রান্তিবশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় নূতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উন্মত্ত প্রায়। এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে, রঘুনাথের বিবেচনা-শক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক। এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, সে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কতশত হতভাগার আরোগ্য। কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে; কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটী পাদপতলে উপবেশন করিলেন,—নিশ্চেষ্ট ভাবে বৃক্ষে ভরদিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতি দূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা! সে সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে, শান্তকাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। নক্ষত্রবিভূষিত নৈশ গগনমণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল।

* * * * *

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণ কথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্তঅবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে,সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকাপূর্ণ সংসারের সে একটী মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গজয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশা নির্ব্বাণ হইয়াছে। এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত, বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহুদিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে। শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীনজনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল। পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল। বাল্যকালে সেই দূর মাড়োয়ারে

ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী—শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল; আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়? সে প্রফুল্ল আশা লহরী কোথায়? এই শোকের দিনে—সন্তাপের দিনে যাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন! বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন! সহোদরা স্নেহপূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্লমুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু শোকের আবাসস্থান।

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন, "ভগবন! অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ?"

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিযুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন। এ স্বপ্ন নহে,—তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন।

উঃ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল, তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপনার তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চিৎকার শব্দ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্যসুখ দূর হউক" অন্য আশা দূর হউক লক্ষ্মি। তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহেনা।" লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতার হৃদয়ে আপনার মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণ ভরে কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা—বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। সুখের লহরীর সহিত দুঃখের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিতধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর ন্যায় এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে? ভ্রাতৃ-স্নেহের ন্যায় পবিত্র স্নেহ আর কি আছে? আমরা সে ভাল-বাসা বর্ণন করিতে অসক্ত। সহৃদয় পাঠক! রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেকক্ষণ পরে দুই জনের হৃদয় শীতল হইল, তখন লক্ষ্মী

আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, "ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমায় দেখিতে পাইলাম। আহা! আজ আমার কি পরম সুখ। দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল?" ক্ষণেক পর আপনার অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, "ভাই। এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ্ হইবে। চল, মন্দিরের ভিতর যাই; আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দিরাভ্যন্তরে আসিলেন। লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষক দিগের সহিত চাস করিতেন; কখন বা গোবৎস মেষপাল রক্ষা করিতেন; মেষের সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জ্জনে বসিয়া গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন। কখন প্রত্যূষে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন।

একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদগ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন। জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয় রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই। পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতৃসেবাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে দেবতারা প্রসন্ন হন।" পিতামাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, সুগভীর অর্থযুক্ত উল্লিখিত উপদেশ বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিতেছে। সাকার দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে পিতামাতাকে আসন প্রদান করিতে হইবে। জনকজননী-মূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী স্নেহের প্রতিমা। সে অনন্ত স্নেহের আদি নাই, অন্ত নাই—সে স্নেহে গুণাগুণের বিচার নাই, সুরূপ কুরূপের

প্রভেদ নাই, সুশীল দুঃশীলের পার্থক্য নাই, বিদ্বান মূর্খের বৈষম্য নাই—সে স্নেহ ধীর ও স্থিরভাবে কল্পান্ত পর্য্যন্তই চলিতে থাকিবে। তবে পিতামাতা দেবতা নয় ত কি? ঈশ্বরের নিকট পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার আছে। কিন্তু পুত্র সৎই হউক আর অসৎই হউক পিতৃস্নেহ উভয়েই সমান ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিগুর্ণ সগুণের তারতম্য করিয়া পিতা কাহারও প্রতি অল্প, আর কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করেন না। পিতার স্নেহ ঈশ্বরের স্নেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা সাকার ঈশ্বরমূর্ত্তি, মাতা শরীরময়ী ঈশ্বরীপ্রতিমা। ইহাদের সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করা হয়। অতএব সাধ্যানুসারে তাহা করিতে চেষ্টা করিবে।

প্রথমতঃ পিতামাতার আজ্ঞা প্রতিপালন। বাল্যকালে জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতার আদেশ সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। কারণ শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা কখনই আমাদিগকে অশুভ-করকার্য্যকরণে অনুমতি করেন না। যাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত, মঙ্গলকর কার্য্য করিতেই তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া থাকেন। পিতামাতার আদেশ প্রতিপালনে কেবল যে তাঁহাদিগেরই সন্তোষ সম্পাদন করা হয়, তাহা নহে; বাল্যকাল হইতে আমরাও আজ্ঞাপ্রতিপালনরূপব্রতে দীক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে উন্নতিলাভ করি। আদেশ প্রতিপালন পৃথিবীতে সুশৃঙ্খলতার সংস্থাপক। কি সামান্য গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, কি রাজদ্বারে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র আজ্ঞানুসরণের প্রয়োজন। পরিবারবর্গ গৃহপতির আদেশে কর্ণপাত না করিলে, ছাত্রগণ শিক্ষকের অনুজ্ঞায় তাচ্ছীল্য করিলে, প্রজাগণ রাজনিদেশের

বশবর্ত্তী না হইলে, অধিনেতার শাসনবাক্যে সৈনিক পুরুষেরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, সুখময়গৃহ পূতিগন্ধনরক, বিদ্যালয় অবাধ্যতার প্রস্রবণ, রাজ্য বিদ্রোহিতার শ্মশান ক্ষেত্র, এবং রণস্থল গোলযোগের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিত। সুশৃঙ্খলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় আজ্ঞাবশবর্ত্তিতা আমরা প্রথমতঃ পিতামাতার নিকট শিক্ষা করি। পিতামাতার অবাধ্য হইলে কেবল যে তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা নহে, হয়ত আমাদিগকেও উন্নতির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। জ্ঞানী ও দূরদর্শী পিতা সৎকার্য্য করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে আদেশ করেন। আমরা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে শৈথিল্য করতঃ যদি অসৎপথে পদার্পণ করি, তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব পিতামাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন, এবং আমাদিগেরও ভাবী জীবনে মঙ্গললাভের উপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন। ঈশ্বরে ভক্তি প্রদর্শন করা যদি মানবমণ্ডলীর কর্ত্তব্য হয়, তবে ঈশ্বরকল্প পিতা মাতকেও শ্রদ্ধা করা একান্ত উচিত। যাঁহাদের কৃপাবলে আমরা এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছি, প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে সংসারে কার্য্যপটু করিয়া তুলিয়াছেন, সেই দেবরূপী জনক জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া থাকিতে পারে, এমন মূঢ় কে আছে? যে ব্যক্তি পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করে, তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি করে না, সে নরাকার হইলেও পশু, বিদ্বান হইলেও মূর্খ, ঈশ্বরবাদী হইলেও

নাস্তিক, ধনবান হইলেও নিতান্ত ঘৃণার্হ। এরূপ লোক সমাজের কণ্টক। তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃকল্প। পিতৃমাতৃভক্তিতে হীনতা নাই, অথবা ইহাতে গৌরবের লাঘব হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক পিতামাতার সেবা করিলে বরং তাহাতে লোকসমাজে প্রশংসাভাজন ও আদরনীয়, এবং পরমেশ্বরের অনুরাগের পাত্র হওয়া যায়। পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন অনেকের কর্ত্তব্যজ্ঞান' বলিয়া ধারণা নাই। লোকনিন্দার ভয়েই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহারা পিতামাতার প্রতি বাহিক ভক্তি দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দাস দাসী অপেক্ষা তাহাদিগকে তত অধিক সম্মান করেন না। তাঁহারা কি মনে করেন, জনকজননীর প্রতি ভক্তি দেখাইলে সম্মানের হানি হয়? পিতৃপাদুকা মস্তকে বহন করিলে, পিতার পাদধৌত করাইয়া দিলে, তাহাতে নিজের লঘুতা প্রকাশ হয় না; বরং ইহা পুত্রের শ্লাঘার বিষয়। মাতৃসেবক পুণ্যনামা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারালয়ে যাইবার পূর্ব্বে যথাবিধি মাতার চরণবন্দনা করিয়া পদরজঃ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। রোম দেশীয় মাতৃভক্ত যুবকদ্বয় বৃদ্ধা জননীর দেবদর্শনে ঔৎসুক্য দেখিয়া শকট পরিবাহক গবাদির অভাবে আপনারাই বাহনত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং মাতাকে শকটোপরি আরোপিত করিয়া শকট বাহন পূর্ব্বক ডেলফির মন্দির সম্মুখে আনয়ন করতঃ জননীর দেবদর্শনবাসনা চরিতার্থ করাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি হয় নাই। প্রত্যুত এই মাতৃসেবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায়, তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়, ও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণে পিতৃভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, রাজা দশরথ, রাণী কৌশল্যা ও প্রজাগণের মনে আনন্দের সীমা নাই। রাজার দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ী এ সুখের অন্তরায় হইলেন। তিনি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরদ্বয় নৃপবরের নিকট বাঞ্ছা করিলেন। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনগমন নির্দ্দিষ্ট হইল। যখন রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন, যে পিতার আদেশে তাঁহাকে যুবরাজ হওয়ার পরিবর্ত্তে বনবাসী হইতে হইবে, অযোধ্যার রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কন্দফলমূলাশী সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে বিচরণ করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অবাতবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অচল ভাবেই রহিলেন। স্থির ও বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি পিতার আদেশে তীব্র হলাহল পান করিতে পারি; হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি; সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারি; অরণ্যে বাস ত অতি তুচ্ছ কথা।" পিতৃভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রঘুকুলতিলক রামের উপযুক্ত উক্তিই বটে। মুখে যাহা ব্যক্ত করিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিলেন। জটা চীর ধারণ পূর্ব্বক অযোধ্যানাথ রাজপুরী আঁধার করিয়া বনাশ্রমে আশ্রয় লইলেন। পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। জগতে অতুল-কীর্ত্তি সুবর্ণঅক্ষরে লিখিত থাকিল। পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসেই পিতৃভক্তির এরূপ অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় না। কত যুগযুগান্তর হইল, রামচন্দ্রের তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতৃভক্তিপরায়ণতা এখনও লোকসমাজে শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

মহাবীর নেপোলিয়ান অস্তার্লিজ,জিনা ও লোডি যুদ্ধ জয় করিয়া যত খ্যাতিও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন, মাতারপ্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শনে তদপেক্ষা অল্প প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। জগদ্বিজয়ী আলেকজণ্ডারও সাতিশয় মাতৃভক্তছিলেন। তাঁহার জননী অলিম্পিয়ার কোপনস্বভাব ছিল। আলেকজণ্ডারের অনুপস্থিতিকালে তিনি রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। মন্ত্রী এণ্টিপেটর বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে কতকগুলি দোষারোপ করতঃ আলেকজণ্ডারের নিকট পত্র লিখিলেন। আলেকজণ্ডার পত্রের উত্তরে এই মাত্র বলিয়া পাঠাইলেন " এণ্টিপেটর! তুমি জান না, আমার মাতার বিন্দুমাত্র অশ্রুজলে তোমার শত শত পত্র নষ্ট করিতে পারে।" মাতার অসন্তোষের নিকট তিনি সমগ্র রাজ্যকে অতি তুচ্ছ পদার্থই মনে করিতেন। এই সমস্ত পিতৃমাতৃভক্ত মহাপুরুষগণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পাইব, মাতাপিতার ভক্তি করা সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তানের ভক্তিগুণে পিতামাতা সন্তুষ্ট হইয়া যে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করেন, নিশ্চয় তাহা সফল হয়। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ সন্তানের অশেষ মঙ্গলদায়ক।

তৃতীয়তঃ পিতামাতা বৃদ্ধ দশায় উপনীত হইলে তাঁহাদিগের প্রতিপালন। নিরাশ্রয় বাল্যকালে পিতামাতা আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদিগের যত্নশৈথিল্য হইলে আমরা কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিতাম না। যখন নিতান্ত নিরাশ্রয়, একান্ত অজ্ঞান, এমন কি দংশমশকাদি হইতেও আত্মত্রাণ করিতে অসমর্থ, আহারগ্রহণ বা বিমূত্রপরিত্যাগ

প্রভৃতি কোন বিষয়েরই জ্ঞান ছিল না; তখন কেবল মাতাই আমাদিগের একমাত্র রক্ষয়িত্রী ও প্রতিপালিকা। পিতার যত্নেই আবার আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষম বৃত্তিগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, হস্তপদাদি দুর্ব্বল, কেশ পলিত, ও মাংস লুলিত হইয়া যায়, যখন ভোজন শয়ন প্রভৃতি অসম্ভ বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন ও পরিপোষণ করা সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই সময়ে আজ্ঞাকারী কিঙ্করের ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে। বৃদ্ধের ভোজন লালসা স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি হয়। স্বেচ্ছায় কোন পদার্থে আহার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, অথবা কোন ধর্ম্মকার্য্য করণে ইচ্ছুক হইলে, সাধ্যানুসারে তাহা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও পিতামাতাকে রক্ষা করিবে। বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গরণ সময়ে যখন নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ধনসম্পত্তিরক্ষণে ব্যস্ত হইয়াছিল, তখন দুইজন যুবক সর্ব্বস্ব বহ্নিমুখে বিসর্জন দিয়া কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পথে প্রস্থান করিয়াছিলেন, শৈলনিঃসৃত আগ্নেয় পদার্থ সে স্থান স্পর্শ করে নাই। অদ্যাবধি সেই স্থান "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পিতৃভক্তির কি চমৎকার উদাহরণ। ঈশ্বর সদয় হইয়া পিতৃভক্তকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

কিন্তু কালের কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত। সময়ের গতির সঙ্গে

সঙ্গে যেন পিতৃভক্তিরও হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার বহুলপ্রচারনিবন্ধনই হউক, অথবা দেশে সভ্যতার বিস্তার বশতঃই হউক, ভারতসন্তান যেন পূর্ব্বতন রীতি নীতির প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিতেছে, এবং পিতৃভক্তিরও যেন ক্রমে ক্রমে লাঘব হইয়া আসিতেছে। পরিবারবন্ধনের আর তাদৃশ দৃঢ়তা নাই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছে। পুত্র পিতাকে এখন আর পূজনীয় শিক্ষক জ্ঞানে যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার স্নেহপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করে না, পিতাকে বিশ্বস্ত সুহৃদ মনে করিয়া গুরুতর দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে ফলপ্রদায়িনী যুক্তি লইতে চাহে না, পিতাকে দেবকল্প প্রভুজ্ঞানে তাঁহার সামান্ত অভিলাষও অনুজ্ঞাবাক্যস্বরূপ মনে করে না। পিতাকে অতি সামান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। দৃশ্য-কাব্য দেশীয় রীতি নীতির দর্পণস্বরূপ। পিতা প্রহসনে হাস্তরসের প্রধান অঙ্গ। জানি না পিতা পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধ আর কতদিন এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পিতার প্রতি এরূপ অপব্যবহার করা কত ন্তায়বিগর্হিত ও পাপজনক। সদুপদেষ্টা ও স্নেহবান্ পিতা পুত্রের যেরূপ উপকারী, শ্রদ্ধাবান্ ও আজ্ঞাবহ পুত্রও পিতার সেইরূপ সন্তোষবিধায়ক। যে ব্যক্তি পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, সে ব্যক্তি পুত্রের নিকট হইতেও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ পিতার প্রতি অপব্যবহার করিলে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকেও যে পুত্র কর্তৃক অপব্যবহৃত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মোগল সম্রাটগণের মধ্যে জাঁহাগীর হইতে

আরম্ভ করিয়া বাহাদুর সা পর্য্যন্ত সকলের বিষয় মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার যথার্থ্য অনুভূত হইবে। পুত্র আমাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, এই স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়াও অন্ততঃ বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহাদিগের কষ্টদূর করা কর্ত্তব্য। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করায় স্বার্থ পরমার্থ উভয়ই আছে।

পিতার ন্যায় শিক্ষকও মাননীয় ও পূজ্য। মহাবীর আলেক্জণ্ডার বলিয়াছিলেন, " পিতা অপেক্ষা শিক্ষক অধিকতর উপকারী ; পিতা স্বর্গীয় আত্মাকে ধরাতলে আনিয়া নরকে নিক্ষেপ করিয়াছেন, শিক্ষক শিক্ষাদানদ্বারা আমাদিগকে জ্ঞানবান্ করিয়া সেই অধঃপতিত আত্মাকে পুনর্ব্বার স্বর্গবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।" ফলতঃ ঐহিক পারলৌকিক উভয়বিধ জ্ঞানদাতাই শিক্ষক। শিক্ষাদ্বারা যে কেবল সাংসারিক জ্ঞান লাভ হয় তাহা নহে, ইহাতে ঈশ্বরভক্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও বিকাশ হয়। ইহজীবনে যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করার, ও পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়ার মূলই সৎশিক্ষক। এরূপ উপকারী ব্যক্তির প্রতি বাধ্যতা ও ভক্তি প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বাধ্যতা ভয়ভক্তিমূলক হওয়া উচিত। কেবল ভয়হেতুক বাধ্যতা অচিরস্থায়ী। শিক্ষক সম্মুখ হইতে অপসৃত হইলেই বাধ্যতাও সেই খানেই পর্য্যবসিত হয়। ভক্তিভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিলে, শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক শিক্ষকের আজ্ঞাবহ হইবে, এবং তাঁহার উপদেশ বাক্যে মনোযোগ করিবে। শিক্ষকের বাক্যে অনবহিততা একটী মহৎ দোষ। ইহাতে যে কেবল

শিক্ষককে অবজ্ঞা করা হয় তাহা নহে, নিজেরও শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হানি হয়। শিক্ষকের আজ্ঞা প্রতিপালন, ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের দৃষ্টান্ত ভারতে অভাব ছিল না। আয়োদ ধৌম্যের শিষ্যদ্বয় উতঙ্ক ও আরুণির উপাখ্যানে গুরুভক্তির কি চমৎকার উদাহরণই প্রদর্শিত হইয়াছে! পল্লীগ্রামস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ভারতে আর-পুস্তক লিখিয়া গুরুভক্তি শিক্ষা দিতে হইত না। অথবা কোন প্রকার বাগাড়ম্বর করিয়া গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বলিয়া দিতে হইত না। শিষ্যগণ স্বভাবতঃই গুরুভক্ত হইয়া উঠিত। এক্ষণে বালকগণ শত শত উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিতেছে, কতপ্রকার শাসনবাক্য তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। বালকদিগের অন্তরে যেন কেমন এক প্রকার স্বাধীনতাভাব প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষকবাক্যে অবজ্ঞা করিতে পারিলেই, অথবা শিক্ষকের সঙ্গে সমভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থ হইলেই, ছাত্রগণ আপনাদিগকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু ইহাই যে তাঁহাদিগের অধঃপতনের মূল, বালকবুদ্ধিনিবন্ধন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ছাত্রদিগের দোষ সংশোধিত হয়, এবং তাঁহারা যথার্থ গুরুভক্ত হইতে পারেন, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ স্ব স্ব দোষ পরীহার পূর্ব্বক শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। শিক্ষক সন্তুষ্ট থাকিলে, এবং ছাত্রেরাও মনোযোগী হইলে, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্য

সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। শিক্ষার্থিগণও ভাবী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

পিতা মাতা ও শিক্ষকের ন্যায় অন্যান্য গুরুজনকেও ভক্তি ও সম্মান করিবে। তাঁহাদিগের নিকট শিষ্ট, শান্ত ও বিনীত-ভাবে থাকিবে। উপহাসকর অথবা চপলতাব্যঞ্জক কোন কথাই তাঁহাদিগের সম্মুখে বলিবে না। যদি তাঁহারা দোষজন্য তিরস্কার করেন, বিনম্রভাবে তাহা সহ্য করিবে। প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করিতে যাইবে না। বিনয় ও শিষ্টাচার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। এই গুণে বিভূষিত হইয়া চরিত্রবান্ পুরুষ হইবে। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা সচ্চরিত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। সচ্চরিত্র হইলেই সংসারে মাননীয়, গণনীয় ও সকলের প্রশংসাভাজন হওয়া যায়।

প্রমীলার চিতারোহণ।

সুবর্ণ শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্তে রতি মৃত কাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু, গলে ফুল মালা,
কঙ্কণ মৃণাল ভুজে; বিবিধভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। চুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,

রক্ষঃ-কুল-নারী-কুল কাঁদে হাহা রবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কর-রাশি তোয় বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রত বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা
স্বরস্বরাবধূধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝল ঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড় কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, ডুবকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ, দেয় হুলা হুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায়রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ :—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটীর গলে :—
চারিদিকে মন্ত্রীদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুর পতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃ-পুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ ; শূন্যকরি পুরী, আঁধার যে এবে
গোকুল-ভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদনিনাদে !

* * * *

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পূত জলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে, মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাবে দৈত্যবালা দলে,

কহিলা ;—" লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার ! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর"—হায়রে, বহিল
সহসা নয়ন-জল ! নীরবিলা সতী ;
কাঁদিলা দানববালা হাহাকার রবে !
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী
" কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?"
আর কি কহিব, সখি ? ভুলনা লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবাকাছে।"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতিপদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুম-দাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষস বাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রক্ষোবালা

যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষশরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারিদিকে, যথা মহা নবমীর দিনে,
শাক্তভক্তগৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় মম তোমার সম্মুখে ; —
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা। পূর্ব্ব জন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব ; কে কবে আমারে ?
'কোথাপুত্র পুত্রবধূ আমার' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কিসুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃ কুলপতি ?'

কি করে বুঝাব তারে ? হায় রে কি করে ?
হা পুত্র! হা বীর শ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস আলয়ে!
নড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ, ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষার যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাথ
অবিচারে, তারে নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধুর্জ্জটি!—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষের শূরে আমি! তব অনুরোধে
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরামলক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী!—

" পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী ।"

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নের রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব-বিজয়ী ,
দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পুরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস । পরম যত্নে কুড়াইল সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিল তাহে ।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া,
স্বর্ণ পাটীকেলমঠ চিতার উপরেঃ—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে ।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে ।
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ।

নিশীথে আগন্তুক।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজিবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখন স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন, যে, প্রথমে দেশে প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিত প্রবর বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য। তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন। "আমি যে কার্য্য সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত

আছি। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডারাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জাইগিরে প্রত্যাবর্তন করি। কেন না হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গী ও সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর। এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।" রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাটসদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন। উত্তরে নানা কথা লেখা আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, একদিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই। রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত-দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে রাজধানীতে আসিয়াছে। দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান। সর্ব্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে।

কখন কখন দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতে-ছেন। অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত হিন্দু ও মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য, আরব, তাতার, ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক্ বা মুসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে। মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি, রাজা বা

জনবদার বহুলোক সমন্বিত হইয়া মহা সমারোহে হস্তী বা অশ্ব, বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন সহস্র অজ্ঞাত লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে।

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিলেন। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দুই একটী বাড়ীর গবাক্ষ ভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল। অনন্ত হর্ম্মশ্রেণীর মধ্যে দুরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা গেল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন,—তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্ত প্রবাহিনী যমুনা নদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতার অনন্তসাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল; যেন সেই গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল; যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুসলমান ধর্ম্ম-বিদ্বেষী; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন দূরে উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্‌জীদের শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্ব্বত শ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। অদ্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম,—সাহসী উন্নত চরিত্র পিতা সাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী!—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যবাণী বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন।

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা,—ভীষণ কার্য্য পরম্পরা,—দুর্গবিজয়, দেশবিজয়, রাজ্যবিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎসর অপূর্ব্ব বিজয়ে, বা অসমসাহসিক কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল।

সে কার্য্য পরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী?—না এখনও ভবিষ্যত আকাশে গৌরবনক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবন রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তীর মস্তকের উপর রাজছত্র উন্মীলিত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল। রাজপ্রাসাদের নাগরা-খানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত হইল। নৈশ নিস্তব্ধতায় গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এমন সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশ-পটে যেন দীর্ঘ নিস্তেজ

প্রতিকৃতি। বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অৰ্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা কোন প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্ম সম্রাট প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণ নয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরেও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন—

"মহারাজের জয় হউক!"

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-শব্দ শুনিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল; বিপদের সময়,—চিন্তার সময়, এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামিকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বন্ধু প্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন, ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বারদিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?"

সীতাপতি উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ

সমস্ত কুশল; আপনি যে সচিবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না। কেননা আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে, অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়,—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাত করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?"

শিব। "তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে, গবাক্ষ দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীতে আসিতেন না। কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সীতা। "নিবেদন করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?"

শিব। "শারীরিক কুশলে আছি;—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?"

সীতা। "প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায়?"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সর্পের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণ দেশের ভীষণ পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য অদ্যাপিও যুদ্ধ করিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস

করিয়া খানার মধ্যে পড়িতাম না—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।”

সীতা। “প্রভু, আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই। আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়াছেন। যিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু খলতার জয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র দেশে এখনও সে কথা কেহ বিস্মৃত হয় নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।”

উৎসাহে উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—

“সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্র-জীবন লোপ পায় নাই। কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে বন্দীস্বরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিব?”

সীতা। “যবে গমনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।”

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"তবে বোধকরি আপনি পলায়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।"

সীতা। "প্রভু তীক্ষ্নবুদ্ধি। প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "সে উপায় কি?"

সীতা। "অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর; কিন্তু পূর্ব্বদিকে সেই প্রাচীরে লৌহ শলাকা স্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় দিগের অসাধ্য নয়। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরিতে অষ্ট জন বাহক আছে, নিমেষ মধ্যে মথুরায় পৌছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে, অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন। তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিব। "আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম। আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটী নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন, প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীব-হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।"

সীতা। "প্রাচীরে যে স্থানে লৌহশলাকা দেওরা আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন ছদ্মবেশে লুক্কাইত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায়, বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।"

শিব। "ভাল, নৌকায় গমন কালে যদি তীরস্থ কোন প্রহরী সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?"

সীতা। "অষ্টজন নৌকাবাহক, ছদ্মবেশী আপনারই অষ্ট জন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তৃণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "মথুরায় পৌছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। "আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন। তিনি আপনার চির পরিচিত, ও বিশ্বস্ত তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পাঠ করুন।"

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি পাঠ করিয়া শুনান।" সীতাপতি লজ্জিত হইলেন। তাঁহার তখন স্মরণ হইল, যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না। কখনও লেখা পড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্রপাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন। পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন,—

"গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন, যাগ যজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দর রূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটী কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত, প্রিয় সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী, আমার সেনারা কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।"

সীতা। "আপনার পুত্র, প্রিয় সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার

সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে; আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলেও হানি নাই। আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন? অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।"

শিব। "সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না। তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।"

সীতা। "যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু, যে আপনার নিরাপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?"

শিবজী নীরবে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"গোস্বামিন্। আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম। কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না। এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি। অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন। নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।"

সীতা। "অন্য উপায় নাই।"

শিব। "তবে সময় দিন। শিবজীর এ প্রথম বিপদ নহে। শিবজী উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।"

সীতা। "সময় নাই, অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন। নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।"

শিব। "আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না। কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থও হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত ও প্রতিপালিত লোককে

বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।”

সীতা। “প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তিদান করুন,—সেই দূর মহারাষ্ট্র-দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমর-তরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।”

শিব। “সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা, তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তি দিবেন; আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্বনাই,—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবেনা।

সীতা। “প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবেনা,—কল্য আপনি বন্দী!”

শিব। “তাহাই হউক,—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।”

সীতা। “তবে আদেশ দিন আমি বিদায় হই।” অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—“গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ, চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কি জন্য?

যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন, আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এ স্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।”

সীতা। “প্রভু! আপনার মিষ্ট বাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্ত অভিলাষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়। ব্রত সাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।”

শিব। “এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না; কিন্তু দিবসে একদিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটাধারণ করিয়া একবার দেখা দেন, দুই একটী বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান, আর দেখিতে পাই না। সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?”

সীতা। “সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটী অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।”

শিব। “ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশে ধারণ করিয়াছেন?” ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—“আমার ললাটে একটী অমঙ্গল লিখন আছে। আমার ইষ্ট দেবতা, যাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট, সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।”

শিব। “এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেবা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?”

সীতা। "কার্য্য বশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটী জানিতে পারিলাম; ঈশানীমন্দিরে একজন সতী সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবন ধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে, এ জীবনে আবশ্যক কি?"

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না, বলিলেন—"সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি, তাঁহার তিরস্কার—তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।"

সীতা। "প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?"

শিব। "জগদীশ্বর আমাকে মার্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীর পুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে, এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।"

প্রায় উদ্বেগরুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহার নাম কি?"

শিবজী বলিলেন, "রঘুনাথজী হাবেলদার।" ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল। শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে অতি কষ্টোচ্চারিত স্বরে, সীতাপতি বলিলেন, "দীপ অনাবশ্যক,—বলুন, শ্রবণ করিতেছি।"

শিব। "আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকটে আসে, ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল, সীতাপতি!

আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট, ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না। কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায় দুর্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।"

"তাহার পর?"

"সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম,—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া, মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করিয়া, সিংহনাদে অগ্রসর হইত! এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি!"

"তাঁহার পর?"

"এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপনার অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।"

"তাহার পর?"

"আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটীও

কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই। যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।" শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

"আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম।"

শিব। "দোষী? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে নাই। আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানিনা। রঘুনাথের যুদ্ধ-স্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধের পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল। সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।"

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,— "সীতাপতি।"

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোস্বামী কে?

সাধারণের উন্নতি।

কোন একটী দেশে কেবল উর্দ্ধতন শ্রেণীর জন কতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিকদিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবার মধ্যে কখন লক্ষ্মী থাকে না। আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোক সকল অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন; দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই; কেবল এই একটী বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মাগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। নিম্ন স্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্যে, বা দ্বিজসেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেই বার ভারতে আর্য্য জাতির প্রথম পতন।

নিম্ন স্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্র বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতা ছিলনা, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষে উন্নতি উন্নতি বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজার ইটের কাঁচা গাঁথনি আছে। এবং বহুকালের গাঁথনি বলিয়া এখন নোনা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও কাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্য-ভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি, যে ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে, কিম্বা গায়ে বল থাকিলে, অথবা লেখা পড়া শিখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে, তত দিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক, ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, লেখা পড়া শিখুক, আর ভদ্র সন্তানের অবস্থা হীন হউক, এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি, সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীর বাসী ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল? না যেথানে ৫০ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, ৫০ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কার কার বারি পাঁসে-জলে ৫০০০ ঘর নবশাখ আছে; সেকরায় সোণারূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁশারিরা ঢালাই গলাই করিতেছে, জেলে, বাগদি মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু পয়সা, দু সিকি আছে, আর সকল জাতির

মধ্যেই পাঁচ সাত জন লেখা পড়া জানে অর্থাৎ চিটি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে, এবং বিল কবজ পড়িতে পারে—এরূপ স্থানে থাকা ভাল?—আমাদের বিবেচনায় অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অন্ন কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে, ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়; প্রমাণ বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি। যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশের সমাজের পতি, তিনি সেই খানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, এবং তমসাচ্ছন্ন। সমাজের নিম্নস্তর সকলের সম্প্রসারণ শক্তি না থাকিলে, উর্দ্ধতন শ্রেণীর কখন স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচ জনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকে দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত,—শিক্ষার সার হইতেছে,—পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউ-

রোপের উন্নতি; এবং আমেরিকার অভ্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচলিত করান নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা সহজে পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচ জনের জন্তে ভাবিতে শিখিব। আমি যদি আরও দশজনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমি ও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শিক্ষা-দোষে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যত দিন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি গণের সহিত নিম্নস্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, তত দিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্ত বেদনা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন, এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আজি কালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে

দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণের শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিতেছে। বড় আহ্লাদের কথা।

পরশমণি।

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমাণিক সনে, লোহ অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ-বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব বদন।
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ।

২

পরশমানিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথায় তাম্বর কর
কোথা বা নক্ষত্রশোভা গগনে ফুটিত!
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধরে,

তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখারে ?
কেবা এই সুশীতল, বিমল গঙ্গার জল,
ভারতভূষণ করি রাখিত ছাড়ারে ?
কে দেখা'ত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে, সাজারে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি —
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী অঙ্গে, নয়নমণির সঙ্গে,
না হয় মানবচক্ষে আনন্দ দায়িনী !—
নদী জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কনী !
তাতেও আনন্দ হয়,— অরণ্য কুজ্ঝটি ময়,
জলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশবলে, সুধায় সুধার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্লঅন্তরে ;

শিখায়ে প্রেমের বেদ ঘুচায় মনের ভেদ
প্রণয়-আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম ভোগবতী জল,
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র ছুটী, যেখানে বেড়ায় ছুটী,
সখারূপে মন সুখে পৃথিবী উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে!

৫

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশকাঞ্চন!
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশেধরা আনন্দকানন!
জননীবদনইন্দু, জগতে করুণা সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশিরশ্মি মাথা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিনআনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসামুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

—

পদ্মের মৃণাল।

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটা পালটা বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

২

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রী লীলা, বল বীর্য্য স্রোতঃশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি।
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,

কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলি ?
লতা, পশু, পক্ষীসম, মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন, বলে বাঁধা কি শিকলি ?
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ? '

৩

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বলবীর্য্য পরাক্রমে, ভবে অবলীলা ক্রমে,
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?

৪

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
জ্বালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি ;
অতুল্য অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধঙ্গকূলে দিতে বাতি ?
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
অ্যারাথন, থার্মাপলি, হয়েছে শ্মশান স্থলী,

গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি ;—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি!
যার পদচিহ্ন ধরে, অন্য জাতি দম্ভকরে,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইছে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি!

৫

দোর্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম!
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম ?
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার,
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম।
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় সে রোম ?
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?

৬

আরবের পারস্তের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন!
সৌভাগ্য কিরণ জালে, উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।—
আরবের পারস্তের কি দশা এখন ?

পশ্চিমে হিস্পানী শেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন!

* * * *

৭

আজি এ ভারতে হায় কেন হাহাধ্বনি।
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত, পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজ এ ভারতে কেন হাহা কার ধ্বনি।
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজি আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি?

৮

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি আশা, কোথা সে উল্লাস,
দম্ভে বসুধার পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয় কোথা সে কৈলাস।
কত যত্নে কত যুগে বনবাসে কষ্ট ভুগে

কালজয়ী হ'ল ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায়রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ!
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস?

৯

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার?
মিসর পারস্ত জাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কিরে চির অন্ধকার?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার।
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তি ক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে,
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার;—
ভারত কিরণময় হবে কি আবার?

ভাই ভগিনী।

ভাইভগিনীর সম্বন্ধটী বড় সুমিষ্ট। শৈশব হইতে একত্রে থাকা, একত্রে শিক্ষালাভ, একত্রে সুখদুঃখভোগ, এই সকল কারণে ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে একটী গূঢ়রূপ সহানুভূতি

জন্মিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলেও তাহাতে ঈর্ষা থাকে না; পরস্পরের মধ্যে সাহায্যদান থাকিলেও, অহঙ্কার থাকে না; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও আত্মগ্লানি থাকে না। ভাই ভগিনীদিগের সম্বন্ধটী মূলতঃ সাম্যসম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্য ভাবটী উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাদিগের মধ্যে কালক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনই তাহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটী একবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই-ভগিনীরা কখনই এই তথ্যটী ভুলিতে পারে না, এবং যাহারা ঐ তথ্যটী বিশেষরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে, তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা প্রকৃতরূপে সাধন করিতে পারে। অতএব শৈশব হইতেই ঐ সাম্যভাবের বীজ তাহাদিগের হৃদয়ে বপন করা কর্ত্তব্য।

এই কাজটী সুসম্পন্ন হইবার একটী অন্তরায়, কন্যা-পুত্রের ইতর বিশেষ। সকল সমাজেই ঐ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুত্রের প্রতি যত্নাধিক্য, এবং কন্যার প্রতি যত্ন-শৈথিল্য প্রায়ই হইয়া থাকে। ফল কন্যাসন্তানের অপেক্ষা পুত্রসন্তানের একটু বেশী যত্ন হইলেই যে উহাদিগের মধ্যে সাম্যভাব উদ্রেকের বিশেষ ব্যাঘাত হয় তাহা নহে।

বাপ মা যেন সত্য সত্যই একটী ছেলেকে বেশী এবং অপর ছেলেটীকে কম ভাল না বাসেন, অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে অহেতুক কোন ইতর বিশেষ না করেন। তাহা হইলে স্ব স্ব সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা জন্মিয়া যাইবে এবং সেই ঈর্ষা যাবজ্জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে না।

কিন্তু সহেতুক বৈষম্যও কোন কোন স্থলে দোষ হয়। যদি একটী ছেলে অন্য ছেলে অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বাপ মায়ের আদুরে হয়, তবে অপর সকল ছেলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ করে। যদি একটী অধিক বুদ্ধিমান্, মেধাবী এবং আবিষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর পায়, তাহা হইলেও ঈর্ষার উদ্রেক হয়; কিন্তু সেই ঈর্ষা প্রবলা হয় না এবং বয়োধিকে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। যদি অনেক গুলি কন্যাসন্তানের পর, একটী পুত্রসন্তান হয়, অথবা অনেক গুলি পুত্র জন্মিবার পর একটী কন্যা জন্মে, তবে তাদৃশ পুত্র বা কন্যা কিছু বেশী আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে, এবং সেরূপ হইলে ভাইভগিনীর মধ্যে কিছু ঈর্ষার উত্তেজন করে, কিন্তু সে ঈর্ষা অতি প্রবলা হইয়া চরিত্র দূষিত করে না। পিতা মাতা যতদূর পারেন, এই সকল সহেতুক বৈষম্যজনিত ঈর্ষার কারণ নিবারণ করিয়া চলেন। আর পুনর্ব্বার বলি, অহেতুক বৈষম্য কোন মতেই চলিতে দিবেন না। আমাদের দেশে একটা উপধর্ম্ম মূলক বৈষম্য আছে—সেটা বিশেষ যত্নসহকারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে পিতামাতার বিশেষ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যে সন্তান জন্মে, তাহার প্রতি একটু বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইয়া থাকে, এবং পিতা মাতার তাদৃশ আনুকূল্য বা প্রতিকূল্যের ভুক্তভোগী সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল বা কঠিনপ্রবৃত্তির হইয়া পড়ে। তাদৃশ সন্তান ভাইভগিনীর প্রতি সমিচীন ব্যবহারে কদাচ সমর্থ হয় না। এই "পয়া," "অপয়া" কথা দুইটীতে অনেক সুখ নষ্ট ও অসুখের বৃদ্ধি করিতেছে। সহর অঞ্চলে শব্দ দুইটীর তেমন প্রাদুর্ভাব

নাই, কিন্তু পল্লিগ্রামে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। এই সকল স্থলে পিতা মাতা একটু সতর্ক হইয়া চলিলে, এবং সন্তান গুলিকে পরস্পর সাহায্যদানে উন্মুখ করিয়া তুলিলে, গৃহবাসের সুখ বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়। বড় ভাই, বড় ভগিনী, ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কাপড় পরাইয়া দিবে, খাওয়াইবে, মুখ হাত ধোয়াইয়া দিবে, তাহাদিগের জুতা কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিবে, খেলানা সাজাইয়া দিবে, তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিবে—এইরূপ হইলে পিতা মাতার বিশেষ আনন্দ জন্মে, এবং ছেলেদের মধ্যেও সৌভ্রাত্রভাব সুসম্বদ্ধ হয়।

যে পরিবারের ছেলেরা এইরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক পালিত এবং শিক্ষিত হয়, সে পরিবারে ছেলের ছেলের ঝগড়া কম হয়; তাহাতে বয়োধিকদিগের যোগ কম হয়, এবং অল্প-কারণে অন্তর্বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

ভ্রাতৃবর্গের বিবাহ হইবার পর, এবং পিতামাতা অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু সুপালিত পরি-বারের মধ্যে এবং পৈত্রিকধনের বিভাগ স্পষ্টরূপে করা থাকিলে, প্রায়ই তাহা হইতে পার না। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে সত্য সত্যই মনের মিল থাকে, তবে তাহাদিগের পত্নীগণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন করিতে পারেন না। জায়ে জায়ে ঝগড়া বাধাইবার মূল (১ম) ছেলের ছেলের ঝগড়া; (২য়) ঝিয়ে ঝিয়ে ঝগড়া—ঐ দুইটী অতি সামান্য বিষয়, এবং অল্পমাত্র সাবধানতায় উহাদিগের প্রতিবিধান হইয়া যায়। ভ্রাতাদিগের মধ্যে উপার্জ্জনক্ষমতার ইতর বিশেষ নিবন্ধন যদি মনোমালিন্যের সম্ভাবনা হয়, তাঁহার প্রতিবিধানের উপায় একটী মাত্র—

পৃথগন্ন হওয়া। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্মতিক্রমে তাহা করা ভাল। মনোমালিন্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেওয়া অনুচিত। আর যাহার উপায় কম, অথবা সন্তানাদি অধিক তাহা দ্বারাই পৃথগন্নতার প্রস্তাব হওয়াই বিধেয়। কিন্তু পৃথগন্ন হওয়া গেলেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে, এবং তাহা না হইলেই উহাদিগের স্বভাবে দোষ জন্মে। পৃথগন্ন হইলেও পরস্পরে সাহায্য চলিবে, সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিষয় বিশেষে সম্মিলিত পরামর্শ হইবে, এবং এক-যোগে অনুষ্ঠান চলিবে। সৌভ্রাত্র এবং সৌভাগিন্য ইহারা নিত্যসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ রক্ষায় পবিত্রতা সাধন হয়, আত্ম-গৌরবের কোন কারণ হয় না, ইহা রক্ষা না করায় পবিত্রতার হানি হয়, এবং লোক-নিন্দাও জন্মে।

পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

আজীব, আরাম ও কার্য্যসৌকর্য্যার্থে আমাদিগের যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা জগদীশ্বরের কৃপায় প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধরার উৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও শস্য বপন ও কর্ত্তন করিতে হইবে; শণ, ঊর্ণা, তুলা প্রভৃতি হইতে সূত্রকরণ, ও সেই সূত্রদ্বারা বস্ত্রবয়ন করিতে হইবে, খনিগর্ভে বিবিধ প্রকার ধাতু উৎপন্ন হইলেও, তদ্দ্বারা ব্যবহারোপ-যোগী গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সাগরের নিভৃত গহ্বরে অসংখ্য রত্নরাজি থাকিলেও, তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা

আভরণাদি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরিশ্রম ব্যতীত ইহার কিছুই সাধিত হয় না। সকলেই যদি আলস্যের বশবর্ত্তী ও কার্য্যবিমুখ হইত, তাহা হইলে আহারোপযোগী শস্যাদিও উৎপন্ন হইত না, পরিধেয় বস্ত্রাদিও সংগৃহীত হইত না, সুখসাচ্ছন্দ্যকর পদার্থের সর্ব্বথা অভাব থাকিত। অধিক কি বাসযোগ্য গৃহের অভাবে তরুতলে জীবন যাপন করিতে হইত। কেবল পরিশ্রম এই সমস্ত বিপৎপাত হইতে মানবসমাজ রক্ষা করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, পরমেশ্বর আমাদিগের হস্ত পদাদি এরূপ কৌশলে সংগঠিত করিয়াছেন, যে, শ্রমসাধ্য ব্যাপারে উহা অবাধে ও অনায়াসে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বরং পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ, হস্তপদাদি বলিষ্ঠ, ও মন প্রফুল্লিত হয়। অতএব পরিশ্রম ক্লেশকর নহে, প্রত্যুত সুখদায়ক। কোন প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই।

ব্যবহার্য্য যাবতীয় বস্তুই পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন। যদিও প্রত্যেক লোকই স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করেন নাই; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের পরিশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষক শস্য প্রস্তুত করিতেছে; তন্তুবায় হইতে বস্ত্রপ্রাপ্ত হইতেছি; পর্য্যঙ্কাদি দারুময় গৃহসামগ্রী সূত্রধরের পরিশ্রমে জাত; উপানৎ-কারের হস্তজাত পাদুকা দ্বারা কঙ্কর কণ্টকাদি হইতে চরণ রক্ষিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন দেশ দেশান্তর হইতে কত শত ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী কতক বা অর্ণবযান সাহায্যে, কতক বা বাষ্পীয় শকট-অবলম্বনে আনীত হইয়া আমাদের সুখসাচ্ছন্দ্যের

বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। স্বদেশেই উৎপন্ন হউক, অথবা বিদেশ হইতেই সমাগত হউক, সকলেরই উৎপত্তির মূল পরিশ্রম। হলচালন, বীজ-বপন প্রভৃতি না করিলে শস্য উৎপন্ন হয় না। দারুময় গৃহ সামগ্রী নির্ম্মাণ জন্য বৃক্ষকর্ত্তন, বিদারণ, পরিকরণ প্রভৃতিতে সূত্রধরের কতই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তন্তুবায় বস্ত্রবয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। উপানৎকার চর্ম্ম পরিকরণ, রঞ্জন, সীবন প্রভৃতি করিলে পর আমরা পাদুকা প্রাপ্ত হই। ফলতঃ পরিশ্রম ব্যতীত কি আহার্য্য, কি পরিধেয়, কি সুখসেব্য কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পরস্পরের শ্রমজাত দ্রব্যদ্বারা পরস্পরের উপকার সাধিত হইবে বলিয়া মনুষ্যেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। যাহার যেরূপ সামর্থ্য ও যেরূপ শিক্ষা সে সেই পরিমাণে মনুষ্যসমাজের উপকার করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের সহায়তা করে। মনুষ্য মণ্ডলীতে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবেরও বৃদ্ধি হইতেছে। এই অভাব নিরাকরণার্থ সকলকেই পরস্পরে সাহায্য করিতে হয়। প্রত্যেকেরই নিজের সমস্ত অভাব পরিপূরণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সকলেই স্ব স্ব জ্ঞান ও ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য করিয়া সকলের প্রয়োজন সাধন করে। কৃষক আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দেয়। তন্তুবায় পরিধেয় সংগ্রহ করে। স্থপতি বাসগৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত। শিক্ষক বালকগণের শিক্ষাদাতা। পুলিস দস্যুচোর প্রভৃতি হইতে সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করে। বিচারপতি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিতণ্ডা ও কলহের মীমাংসা করেন। কবিরাজের ঔষধদ্বারা রোগ নিবারিত হয়। ব্যবহারজীবী

রাজদ্বারে বিবদমান দলের পক্ষ সমর্থনে নিরত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, যে, আমরা সকলেই এক সমাজে বাস করি, এবং সাধ্যানুরূপ পরিশ্রম দ্বারা পরস্পরের অভাব বিমোচনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিব।

পরিশ্রমে নীচতা নাই। ইহাতে সম্মান বা পদগৌরবের হানি হয় না। পরিশ্রমসাধ্য সামান্ত কার্য্যকরণে আমরা অনেক সময়ে সম্মানের হানি হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু মহাত্মাগণের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে, আমাদের এ বিষম ভ্রম অপনীত হইবে। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন মহাসভা ভঙ্গের পর নিশাবসানে দ্বারদেশে আপনার শকট অনুপস্থিত দেখিয়া তীব্র তুষারপাতের মধ্য দিয়া পদব্রজে নিজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। বোড়ন পর্ব্বতের শিখরদেশে অট্টালিকাপ্রতিষ্ঠাসময়ে অন্যান্য ব্যক্তিগণ যানারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মহামনাঃ স্থবির গ্লাডষ্টোন চরণচারণে ঊর্দ্ধস্থিত শৈলচূড়ায় অধিরোহণ করিলেন। এই একটী মাত্র নহে, মহাত্মাগণের চরিত্রে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশ্রমে নীচতা প্রকাশ হইলে, কখনই তাদৃশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এরূপকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না। আপনার কার্য্য সমাধান নিমিত্ত শারীরিক সামর্থ্যানুরূপ ব্যাপারে নিরত হইলে, লোকসমাজে নিন্দিত বা ঘৃণিত না হইয়া বরং প্রশংসিত ও সম্মানিত হওয়া যায়।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। কার্য্য সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাদাতা। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে আমরা অনেকের সঙ্গে পরিচিত হই, এবং পদার্থের যাথার্থ্য আমাদিগের উপলব্ধ হয়।

সুতরাং ভূয়োদর্শনজনিত নবনব জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে থাকে। সংসারে জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভ্যুদয়ের যে এতদূর বৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক শ্রমই তাহার নিদানীভূত কারণ। •

যে জাতি প্রভৃত পরিশ্রমশীল, পৃথিবীতে সেই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ও বলশালী। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, জর্ম্মান ও মার্কিন জাতি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ভারতে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডে তাহার সহস্রাংশের একাংশও উৎপন্ন হয় কি না সন্দেহ; তথাপি ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের ধনবাহুল্য শতগুণ অধিক। জগদীশ্বরের কৃপায় ভারতভূমি অসাধারণ উর্ব্বরতাশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ইংলণ্ডের নিতান্ত দরিদ্রও ভারতের অনেক লোক অপেক্ষা ধনবান্। এরূপ বৈষম্যের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ভারতবাসীর পরিশ্রমবিমুখতা। ভারতের ভূমি উর্ব্বরা, ভারতের আকর রত্নরাজি পরিপূর্ণ, ভারতের বনভূমি বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, কেবল পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের অভাবে ভারত এতদূর হীনাবস্থায় রহিয়াছে। ফলতঃ আমরা স্বয়ং আমাদিগের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের নির্ম্মাতা। সর্ব্বসুখপ্রদ পরিশ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমরা কার্য্য করিতে থাকি, তাহা হইলে পরিণামে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। আর যদি বিঘ্নোৎপাদিনী দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও একান্ত কার্য্যবিমুখ হইতে অভ্যাস করি, তবে চিরজীবন কেবল দুর্ভাগ্যের দাস হইয়া অপার দুঃখ-সাগরে ভাসিতে থাকিব।" পরিশ্রম সৌভাগ্যের স্রষ্টা, আলস্য সৌভাগ্যের সংহারক।

পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যবসায়েরও প্রয়োজন। তাহা হইলে মণিকাঞ্চনের পরস্পর সম্মিলন হয়। পরিশ্রম সৌভাগ্যের উৎপাদক, অধ্যবসায় সৌভাগ্যের পরিপোষক; পরিশ্রম বীজের অঙ্কুর জনয়িতা, অধ্যবসায় বৃক্ষের পরিবর্দ্ধক ও ফল প্রদায়ক; পরিশ্রম আরম্ভ, অধ্যবসায় ফল প্রাপ্তি; ফলতঃ উভয়ই মানব-সমাজের উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। সংসারে মাননীয় ও গণনীয় হইতে ইচ্ছা থাকিলে, অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। আরব্ধ কার্য্য অবিচলিত-যত্নে সাধন করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কখনই শিথিলযত্ন হইবে না। পুরুষকার অধ্যবসায়ের নামান্তর মাত্র। দৈব সর্ব্বোপরি প্রবল হইলেও পুরুষকার সামান্য প্রবল নহে। অভ্যাস দ্বারা যেমন সময়ে সময়ে স্বভাবকে অতিক্রম করা যায়, আত্মশক্তি প্রভাবে সেইরূপ দৈবকেও অতিক্রম করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। উদ্যোগী পুরুষেরা অধ্যবসায় বলে উন্নতি লাভ করেন, কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে, কিছুই সিদ্ধ হয় না। সুপ্ত সিংহের মুখবিবরে "মৃগগণ স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ" করে না। নিতান্ত সামান্য কার্য্য সাধনেও পরিশ্রম ও দৃঢ় যত্নের আবশ্যক। লোকে বলিয়া থাকে "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—সৎকার্য্যে অনেক বিঘ্ন। কোন সাধুকার্য্য সম্পাদনে উদ্যুক্ত হইলে, শত শত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। কার্য্যারম্ভ মাত্রেই, বিপত্তিতে নিপতিত হইয়া যিনি আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনি নিতান্ত কাপুরুষ। যিনি বিপদের উপর বিপদ অব্যাকুলিতচিত্তে সহ্য করিতে পারেন, বিঘ্নের দুর্ব্বহ ভারে

যাঁহার স্থিতিস্থাপকগুণোপেত চিত্ত সঙ্কুচিত হয় না; কার্য্যের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যিনি অচল ও অটলভাবে নিরন্তর যত্ন করিতে থাকেন, তাঁহারই অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকেই আলিঙ্গন করেন। পরিশ্রমবিমুখ অধ্যবসায়হীন নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হন।

অধ্যবসায়রূপ সাধনার সিদ্ধি ও সুনিশ্চিত। কোন গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধি লাভ জন্য আজ হইতে আমরা উদ্‌যুক্ত হইলাম। কিন্তু উদ্‌যুক্ত হইবা মাত্রই যে তাহার ফল পাইব সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। বীজবপন মাত্রেই তরুক্ষের ফল প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা যেরূপ উপহাস জনক, কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তাহার সিদ্ধির প্রত্যাশা করাও সেইরূপ অদূরদর্শীর কাজ। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও যদি বিফলপ্রযত্ন হইতে হয়, তথাপি আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ পদস্খলিত হইয়াও যাঁহার উত্থানচেষ্টা অবিকৃত থাকে, ধরাধামে তিনি সিদ্ধ পুরুষ। তরঙ্গে বারম্বার আহত হইয়াও যে অধ্যবসায়শীল নাবিক তরণীর কর্ণ পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিশ্চয়ই যথাসময়ে আপনার অভীপ্সিত বন্দরে উপস্থিত হইতে পারেন।

দেশ কাল পাত্র ভেদে অধ্যবসায়ের ফল কখন বা শীঘ্র কখন বা বিলম্বে কার্য্যকারী হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যখন জাতীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন হইল, তখন কে মনে করিয়াছিল, যে দুই বৎসর কাল মধ্যেই তাহা হইতে অমৃতময় ফল প্রসূত হইবে? ইয়াংকিগণ * ইংলণ্ডের শাসনভার হইতে

* ইংরেজেরা যুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণকে "ইয়াংকি" বলিতেন।

মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন হইবে? ইহার কারণ এই যে, যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের একটী অধিনিবেশ মাত্র; তদ্দেশবাসিজনগণ ইংরেজবংশসম্ভূত; তাহাদিগের বল, বীর্য্য, অধ্যবসায় ইংরেজ জাতি হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। সভ্যতা ও ও বুদ্ধিকৌশলে তাহারা ইংরেজের সমকক্ষ। বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যে ইংরেজ অপেক্ষা তাহারা অধিকতর প্রাজ্ঞ। এরূপ জাতি কেন অপরের অধীন হইয়া থাকিবে? আপনাদের অভিলষিত সাধনের নিমিত্ত যেইমাত্র তাহারা কৃতসংকল্প হইল, অচঞ্চল অধ্যবসায়সহকারে অভীপ্সিত লাভে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি অত্যল্প কাল মধ্যেই বিদেশীয়গণের শাসনভার পরিক্ষেপণ ও স্বাধীনতা লাভ করিল। এক্ষণে যুক্তরাজ্য সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ধনগৌরবে, বিজ্ঞানচর্চ্চায়, ও শিল্পনৈপুণ্যে অদ্বিতীয়। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এই উন্নতির মূল।

অধ্যবসায় প্রভাবে নব নব অপরিজ্ঞাত দেশ আবিষ্কৃত হইতেছে, শিল্পকৌশলের বৃদ্ধি সাধন হইতেছে, বিজ্ঞান সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইতেছে, অতি হেয় মানবগণও অমানুষী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ দেবভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের কথা একবার মনে করিয়া দেখ। কলম্বস যখন স্পেনের রাজদম্পতির সমক্ষে "আটলাণ্টিকের পরপারে একটী বৃহৎ মহাদেশ আছে" এই কথা বলিলেন; তখন কত লোক তাঁহাকে কত বিদ্রূপ করিল, কত তিরস্কার করিল, কত নিরাশ বাক্য প্রয়োগ করিল; কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়ী কলম্বস কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অর্ণবযানারোহণে দুস্তর আটলাণ্টিকের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। পথে কত বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আমেরিকার তীরভূমিতে উপনীত হইলেন। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে, ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি শবদর্শিত-গৃধ্রবৃন্দের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অধ্যবসায়শীল কলম্বসের যত্ন ও পরিশ্রমের প্রসাদে ইউরোপবাসীরা আমেরিকা হইতে ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

এডিষ্টোনের আলোকস্তম্ভে ধীরমতি স্মিটনের অসাধারণ অধ্যবসায়শীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আলোকস্তম্ভের কিয়দংশ সংগঠিত হইতেছিল, আবার দুর্দ্দম জলোচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। পুনঃ পুনঃ যতই ভগ্ন হইতে লাগিল, স্মিটনের অধ্যবসায় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আলোকস্তম্ভ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কিছুতে তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হইল না। পরিশেষে দুর্দ্দমনীয় বারিধিরও উদ্যমশীল যুবকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এক্ষণে সেই আলোকস্তম্ভ সাগরগর্ভে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয় নির্ম্মাতার অচঞ্চল অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুর্ব্বার জলধি অবনতমস্তকে তাহার পাদপীঠ বিধৌত করিতেছেন। অধ্যবসায়সম্ভূত শিল্পনৈপুণ্যের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

যত্নশীল মহাপুরুষ ষ্টিফেনশন বাষ্পের বল নির্দ্ধারণ করতঃ জগতের কি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন! বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতের তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারই কৃপাবলে আমরা এত সুখ স্বচ্ছন্দে দূরদেশে যাতায়াত করিতেছি।

ধর্ম্মবীর গৌতম ও চৈতন্য, রণবীর নেপোলিয়ান্ ও ওয়াসিং-

টন, বিজ্ঞানবিৎ গ্যালিলিও ও নিউটন, বাগ্মিবর ডিমস্থেনিস্ ও বার্ক, সকলেই স্ব স্ব পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে পৃথিবীতে অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। কালবশে তাঁহাদিগের মর্ত্ত্য-শরীরের বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের যশঃশরীর কল্পান্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিয়া "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই সাধু-বাক্যের প্রমাণ করিবে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যক্তিগত উন্নতির মূল। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় জাতিগত অভ্যুদয়ের অসাধারণ হেতু।

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটী শশীপরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষবিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সম্বৎসর, ছুই পক্ষ সাতবার।
তন্ত্রমন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ, সুখদুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইঁদুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম, শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে সুন্দর, সুধার সাগর, কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে, চিন্তামণি ঘরে, বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥

ব্যাস বর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ-অংশ, ঋষিগণ অবতংশ,
যাহা হ'তে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ, নানা মত পরিচ্ছেদ,
বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥
সদা বেদপরায়ণ, প্রকাশিলা পারায়ণ,
শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর, শুকদেব বংশধর,
জননী যাঁহার সত্যবতী ॥
দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর,
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোপ পাকা দাড়ি, পায়েপড়ে দিলে ছাড়ি,
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু ॥
স্কন্ধে পালে চড়ক ফোটা, গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কৃষ্ণ মৃগ বাঘছাবা,
সারি সারি হরিনাম লেখা ॥

তুলসীর কণ্ঠী গলে, লম্বিমালা করতলে,
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুসাশন, কক্ষতলে সুশোভন,
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটীতটে ডোর ধরি, তাহাতে কৌপীন পরি,
বহির্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বফল, করঙ্গে পিবার জল,
হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ,
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা যত,
তর্কাতর্ক নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান,
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র জপ, কোথা কোন্ যজ্ঞ হয়,
আগে ভাগে উতরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন,
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে,
চিরজীবী নরাকার লীলা।
একদিন দৈববশে, শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে
নৈমিষকাননে উত্তরিলা॥

ভগ্নোরু দুর্য্যোধন।

১

দিবা অবসান প্রায় ; পড়িছেন ঢলে,
লোহিতবরণ ছবি অম্বর ত্যজিয়া রবি
জলধির অতল শলিলে।
জগৎসবিতা যিনি তেজের আধার,
বারুণীসেবনফলে এ দশা তাঁহার।

২

আমিও গরলময় বিষয়বারুণী-
পিপাসায় হয়ে অন্ধ মানি নাই প্রতিবন্ধ,
সাধু উপদেশ নাহি শুনি ;
তার ফল এতদিনে হায় রে! ফলিল,
অনন্তকালজীবনে জীবন মিশিল।

৩

কি কুক্ষণে কুরুক্ষেত্রে সমরঅনল
করিলাম প্রজ্বলিত ; আহুতি দিলাম যত
ভাই বন্ধু আত্মীয় সকল।
তবু না নিবিল সেই কাল হুতাশন,
পূর্ণাহুতি হবে এবে আমার জীবন।

৪

ধীরে ধীরে পরে ধরা তমোময় বাসে—
গোধূলী ললাট পরে, শুভ্র মুক্তাফলাকারে,
একটী নক্ষত্র কিবা হাসে!
স্তব্ধীভূত ক্রমে বিশ্ব হতেছে এখন,
পশু পক্ষী জীব সব নিদ্রায় মগন।

৫

বিধাতার সাক্ষী নৈশ সুনীল গগন
সহস্র নয়ন মেলি, নিরখিছে কুতূহলি,
পাপাচার নরের এখন।
দেখিলে কি হে আকাশ! অন্তরে আমার
জ্বলিতেছে কি ভীষণ বহ্নি দুর্নিবার?

৬

সহস্র বৃশ্চিক-দংশ যাতনার সম
পূর্ব্বস্মৃতি হলাহলে, অনুতাপ তুষানলে,
পোড়াইছে হৃৎপিণ্ড মম।
পুত্রভ্রাতৃশোকজ্বালা, শারীরযন্ত্রণা,
সকলের গুরুতর এ ঘোর যাতনা।

৭

সভাস্থলে পাঞ্চালীর করুণ রোদন,
কমলনয়নে তার তারাকারা অশ্রুধার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঘনে ঘন,

"হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলি কাঁদে উত্তরায়
ঊর্দ্ধমুখে যোড়করে পাগলিনী প্রায়।

৮

সেই মূর্ত্তি—সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,
যে দেখেছে, যে শুনেছে, হৃদয় গলিয়া গেছে,
চিত্তে কত হয়েছে বিষাদ।
কলুষে কঠিনীকৃত পাষাণ-অন্তর
অচল অটল ভাবে আছিল আমার।

৯

সতীর সে কোপানল দাবাবলসনে
নিশ্বাস পবন মিশি, করিল রে ভস্মরাশি
সুবিস্তৃত কুরুকুল বনে
শাখাছিন্ন বৃক্ষ আমি আছি অবশেষ,
না পোহাতে কালরাত্রি হব ভস্ম-শেষ।

১০

জাগিছে অন্তরে আজ সে দিনের কথা —
স্মরিয়া সে মহাপাপে, জ্বলে প্রাণ মনস্তাপে
গলে হৃদি মর্ম্মে পাই ব্যথা;
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু অর্জ্জুন-নন্দন
সপ্তরথী মিলে তার করিনু নিধন!

১১

নিরস্ত্র, নারথ সেই শিশু সুকুমার

ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিহরি, অন্যায় সমর করি,
সবে মিলে করিনু সংহার।
নবীন কমলকলি না হ'তে বিকাশ,
তুষার-আসার-পাতে হইল বিনাশ।

১২

বৃকোদরে বিষদান, জৌগৃহদাহন,
জিনিয়া কপটদ্যূতে, ধর্ম্মবান্ কুন্তীসুতে,
রাজ্যধন করিনু হরণ।
হৃদে প্রজ্বলিত যে যন্ত্রণা-হুতাশন,
এ পাপ-কলাপ তার হতেছে ইন্ধন।

১৩

সৌভাগ্যের উচ্চচূড়ে আরোহণ করি,
আবৃত কুমন্ত্রী-দলে, তার উপদেশ বলে,
বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত করি,
সুপথ কুপথে কভু করি নি বিচার,
পুণ্যভ্রমে পাপাচার করেছি প্রসার।

১৪

ভাবি নাই নরভাগ্য চক্রনেমী প্রায়,
অহর্নিশ বিঘূর্ণিত, উন্নত বা কভুনত,
সুখ দুঃখ ক্রমে আসে যায়;
আজ যেই সৌভাগ্যের রবিকরে হাসে,
কালি তারে দুঃখের জলদ-জালে গ্রাসে।

১৫

হস্তিনার রাজা আমি,—কুরুকুল মণি—
ভাই, বন্ধু, ধনে, জনে, কুলে, শীলে, দানে, মানে,
ভারতের রাজশিরোমণি,
শত শত নৃপকুল-কিরিটী, আমার
পদধূলীপরশেতে হয়েছে ধূসর।

১৬

রাজ্যহীন, ভ্রাতৃহীণ-বন্ধুহীন এবে,
তৃণাসনে ছিন্নবাসে, রয়েছি শ্মশান বাসে,
গৃধিনী শকুনী উচ্চস্বরে
ফেরুপাল সহমিশি গাইছে গভীরে,
পাপের কাহিনী মম, কাঁপায়ে মহীরে।

১৭

এস মৃত্যু! অভাগায় কর আলিঙ্গন,
তব অঙ্গ পরশিয়া জুড়া'ক তাপিত হিয়া
নিবুক অন্তর হুতাশন।
আধি ব্যাধি বিপীড়িত মুগ্ধ নরগণ,
লভে শান্তি তব কোলে করিয়া শয়ন।

১৮

ধনমদমত্তনর! বৃথা অহঙ্কার!
জানিও অস্থির ভবে, চিরস্থির নাহি রবে,
ধনজন সকলি অসার।
সৌভাগ্যসময়ে কর সুপথ আশ্রয়,
অনুতাপানলে দগ্ধ হবে না হৃদয়।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন অপেক্ষা শরীররক্ষাই প্রধান ধর্ম্মসাধন। শরীর ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি পুরুষার্থ সাধনের অবলম্বন স্বরূপ। ইহ জীবনে সুখসম্ভোগ ও পরলোকে অনন্ত শান্তিলাভের বাসনা থাকিলে সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করিতে হইবে। কি ধনী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, দেহরক্ষায় সকলেরই যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন। নীরোগ শরীর সুখ সৌভাগ্যের আকর। তুমি ধনিসন্তান, রত্নরাশি পরিবেষ্টিত হইয়া আছ, বিলাসিতার সুকোমল ক্রোড়ে লালিত হইতেছে, আজ্ঞাবচনের অর্দ্ধ-নিঃসারণ মাত্রেই ভৃত্যগণ তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু তোমার দেহ রোগগ্রস্ত। আবার আমি দরিদ্র; ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন করিয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত হইতেছি, শীতাতপে দৃক্‌পাত না করিয়া উদরান্নসংস্থানের নিমিত্ত পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু আমার শরীর নীরোগ। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বিদ্যার বিমল-জ্যোতিঃ তোমার অন্তরে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইতেছে; কিন্তু রোগে তোমার দেহ জীর্ণপ্রায়। আমি নিরক্ষর মূর্খ; অজ্ঞতা-রূপ নিবিড়ান্ধকারে আমার চিত্ত সততই সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু আমার শরীরে রোগ নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, অসীম ধনরাশির অধিপতি ও সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী হইয়াও কেবল শারীরিক অনাময় জন্য তুমি যে পরিমাণে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছ, আমি নির্ধন ও মূর্খ হইয়াও কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যনিবন্ধন সেই

পরিমাণে সুখসম্ভোগ করিতেছি। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার লোকের পক্ষেই স্বাস্থ্যসুখানুভব অতীব প্রার্থনীয়।

শরীরের সহিত মনের অতীব নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকিলে, মনও শান্তিপূর্ণ, স্ফূর্ত্তিমান্ থাকে। শরীরে কোনরূপ রোগের সঞ্চার হইলে, মনও নিস্তেজ ও উৎসাহশূন্য হইয়া যায়। মন বিষণ্ণ ও কার্য্যনিস্পৃহ হইলে, কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক কোন প্রকার কার্য্যে বা চিন্তায় লিপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ইহ সংসারে উন্নতির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, চরমে পরমপদলাভের প্রত্যাশাও একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। ইহ জীবনে উন্নতি লাভে বঞ্চিত, ও পরলোকে শান্তি প্রাপ্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া ক্ষণবিধ্বংসী দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই অবিনশ্বর আত্মাও কার্য্যবিমুখ হইয়া যেন বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ধরণীতলে পুরুষোচিত গৌরব লাভে ইচ্ছা থাকিলে, আত্মার মঙ্গল সাধনে তৎপর হইতে হইলে, সর্ব্বোপায়ে শরীর রক্ষা বিধানে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায় এই ভৌতিক দেহ রক্ষা করিতে হইলে, যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং সাধারণতঃ যাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, এক্ষণে তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। শত সহস্র প্রকারে যত্ন করিলেও যদিও এই শরীরকে বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করা যায় না, তথাপি যত দিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ শরীর যাহাতে নীরোগ ও সুস্থ থাকে সাধ্যানুসারে তৎপক্ষে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শরীররক্ষোপযোগী দুই একটী নিয়মের অবতারণা করা প্রয়োজন বোধে এস্থলে তাহা বিবৃত করা গেল।

শরীররক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় আহার। কি প্রাণীজগৎ কি উদ্ভিদ্‌জগৎ আহারই সর্ব্বত্র শরীরের পোষণকারী। কৈশিকা-কর্ষণপ্রভাবে যেমন মূলপরম্পরাদ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস পরিবাহিত হইয়া উদ্ভিদের শরীর রক্ষা করে; সেইরূপ আমাদের ভুক্ত পদার্থের সার ভাগ রক্তাকারে পরিণত হইয়া কৈশিকা ও ধমনীপথে প্রবাহিত হওত শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। রক্তই শরীরের তাপ পরিবর্দ্ধক, রক্তই শরীরের পরিপোষক, রক্তই জীবের জীবনীশক্তি। সুতরাং যেরূপ খাদ্য আহার করিলে দেহে যথোপযুক্ত শোণিত সম্ভব হয়, তাহাই আহার করা কর্ত্তব্য। লৌহ শোণিতের প্রধান উপাদান। খাদ্যপদার্থের শ্বেতসারে লৌহের ভাগ অধিক। যাহাতে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, শরীরের তাপরক্ষা ও রক্তবর্দ্ধনজন্ত তাহা অন্তান্ত খাদ্য অপেক্ষা কিছু অধিকভাগে আহার করিতে হইবে।

অস্থি, মাংস ও রক্তদ্বারা শরীর সংগঠিত। এই ত্রিবিধ পদার্থের উপচয় সম্পাদন দ্বারা শরীর রক্ষিত হয়। যেরূপ আহার্য্যে শোণিত সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে মাংসজনন খাদ্যের কথা বলা হইতেছে। প্রস্ফুরক নামক খনিজপদার্থ মাংস নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান। শস্য, ডিম্ব ও অন্তান্ত প্রাণীজ খাদ্যে প্রস্ফুরকের ভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাংস সংগঠন জন্ত ঐ সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করাই প্রয়োজন।

মাংস ও শোণিত বর্দ্ধনের ন্তায় অস্থিবর্দ্ধনও আবশ্যক। অস্থি শরীরের গঠনকাষ্ঠ স্বরূপ। অস্থি দৃঢ়ত্ব ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলে

শরীরও বলিষ্ঠ ও কষ্টসহ হয়। বলশালী হইতে ইচ্ছা করিলে অস্থির স্থূলতা বর্দ্ধন করিতে হইবে। অতএব অস্থিপরিবর্দ্ধক আহার্য্যের ব্যবহারও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত পদার্থে লবণ, চুণ ও সোডা নামক এক প্রকার সামগ্রী পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেই অস্থি বর্দ্ধন করে। খাদ্য দ্রব্যের সহিত উল্লিখিত সামগ্রী গুলিও যথানির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে পরিমাণে মাংসজনন পদার্থ আহার করা হয়, শোণিত-জনন পদার্থ তাহার দ্বিগুণ এবং অস্থিজনন পদার্থ তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিলেই শরীরপোষণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যথানিয়মে এই সমস্ত সামগ্রী ভোজন করিলেই শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপার অবাধে ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, শরীরও অনাময় হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিনাশকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সংরক্ষিত হয়।

আহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে মহান্‌ অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে। অনশনে শরীর যেমন দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায়, অতি-ভোজনেও আবার বহুবিধ রোগ আবির্ভূত হইয়া শরীরকে সেইরূপ নিস্তেজ ও ক্ষীণ করিয়া তুলে। আপাতমধুর পাপ কার্য্যে রত হইয়া পরিণামে যেমন তাহার বিষময় ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তেমনি রসনার আস্বাদনকারী আহারীয় সামগ্রী প্রচুরমাণে উদরসাৎ করিয়া পরিশেষে সেই অতিভোজন জনিত রোগবিশেষ দ্বারা আক্রান্ত হওতঃ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিয়াও রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন হইয়া উঠে; অনাহারই অতিভোজনপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, যে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নিয়মের

অতিরিক্ত আহার করিয়া শরীরে কিরূপ যাতনা উপস্থিত হয়। কেহ কেহ আবার আপনার ঔদরিকপটুত্ব প্রদর্শন জন্ম উদর পূর্ণ আহারের পর, যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্টান্ন সামগ্রী কষ্টে সৃষ্টে চক্ষুমুদ্রিত করিয়া গলাধঃকরণ করেন! তাঁহারা বুঝেন না যে সামান্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কি পৈশাচিক ব্যাপারে রত হইতেছেন—মুখরোচক হলাহল অমৃত জ্ঞানে ভোজন করিতেছেন। পরিণামে যে উহা প্রাণসংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা একবারও ভাবিতেছেন না। এই অতিভোজনজনিত রোগের যাতনায় যখন নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিবেন, তখনই উহার বিষময় ফল অনুভূত হইবে। অনিয়মিত আহার বস্তুতঃ বহুবিধ রোগের আকরস্বরূপ। শরীররক্ষা করিতে হইলে, অতিভোজন সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

নিয়মিত আহার যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, শরীরের পরিষ্কারতাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। বাসগৃহের নিকটে কোন স্থানে আবর্জ্জনা থাকিলে আমরা সহ্য করিতে পারি না; কিন্তু শরীরের অপরিষ্কারতার প্রতি আমাদিগের লক্ষ্য অতি অল্পই থাকে। শরীর অপরিষ্কার থাকিলে লোমকূপ সকল আবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অভ্যন্তরীণ মলাদি আর স্বেদরূপে বহির্গত হইতে পারে না, এবং পরিষ্কৃত বায়ুও শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রক্ত বিশোধন কার্য্যের সাহায্য করে না। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে।

শরীর পরিষ্কার রাখিতে হইলে জলের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। হস্তপদাদি সর্ব্বদা বস্ত্রাভ্যন্তরে থাকে না। বায়ুসংস্পৃষ্ট ধূলীকণা ও বায়ুমধ্যে ভাসমান অন্যান্য দূষিত পদার্থের

পরমাণু অনবরত হস্তপদাদিতে সংলগ্ন হইতে থাকে। সুতরাং শরীরের অপরাপর অংশ অপেক্ষা হস্তপদই অধিকতর মলাসংশ্লিষ্ট হয়। তজ্জন্ত প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার তাহা ধৌত করা আবশ্যক। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাতে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার সময় যে হস্ত পদ ধৌত করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, উহা পরিষ্কারতাসম্বন্ধীয় নিয়মের একটী চমৎকার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত।

অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার রাখায় আর-একটী প্রধান উপায়। যে স্থানে নদী অথবা নির্ম্মলজলা পুষ্করিণী আছে, তথায় অনায়াসে স্নানকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। স্নানের ন্যায় ব্যয়শূন্য বিলাসিতা আর কিছুই নাই। স্নান করিতে হইলে যে পরিমাণে কষ্ট ও বিরক্তি স্বীকার করিতে হয়, স্নানজনিত স্বাস্থ্য ও সাচ্ছন্দ্য তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ তৃপ্তিকর ও সুখপ্রদ।

কেহ কেহ জলের প্রভূত ব্যবহারে নিতান্ত ভীত হন। স্নানের কথা দূরে থাকুক, সপ্তাহের মধ্যে একবারও তাঁহারা হস্ত পদাদি ধৌত করেন কিনা সন্দেহ। জলাতঙ্ক রোগে তাঁহাদিগকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, যে অন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রত্যহ স্নান করিতে দেখিলে তাঁহারা শীহরিয়া উঠেন। জলের ব্যবহার না করায়, তাঁহাদের শরীর এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, যে দৈব ঘটনা বশতঃ যদি শরীরে বৃষ্টিবিন্দু পতিত হয়, অথবা কোন শৈত্যক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। শরীর পরিষ্কার রাখিবার জন্ত বাল্যকাল হইতেই স্নানের নিয়ম অভ্যাস করা প্রয়োজন; এবং আজীবন

এই নিয়ম অবিকৃতভাবে রক্ষা করিতে পারিলে, অনেক সময় রোগের হস্তে পতিত হইতে হয় না।

শরীর সুস্থ রাখিবার আর একটী প্রধান উপায় অঙ্গসঞ্চালন। মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে, শরীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং মনও নিরুৎসাহ হয়। কার্য্যকরী মানসিক বৃত্তিগুলিও ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে। স্মৃতির আর ধারণাশক্তি থাকে না। বুদ্ধিও জটিল বিষয়ে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়। চিন্তাশক্তি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিষয়বিশেষে নিবিষ্ট থাকিতে সমর্থ হয় না। কায়িক শ্রমবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মানসিক পরিশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক লোক সমাজে উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত যে অমানুষিক-চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া যায়, তাহা কিছু মাত্র ফলপ্রদ হয় না। বরং শরীর রুগ্ন, মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আতপতাপিত পথিক যেমন বৃক্ষচ্ছায়ায় উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্ত শরীর সবল ও সুস্থ করিয়া পুনর্ব্বার ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়। অনবরত মানসিক পরিশ্রম হেতুক মন যখন স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া উঠে, তখন কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে নিবিষ্ট হইলে, সেইরূপ মানসিক অবসাদ নিরাকৃত, শরীর নব বলে বলীয়ান্, ও আভ্যন্তরিক বৃত্তি সকল উন্মেষিত হইয়া পুনর্ব্বার আরব্ধ কার্য্যে নূতন প্রবৃত্তি প্রদান করে। ফলতঃ শারীরিক পরিশ্রম মানসিক পরিশ্রমের বিশ্রাম স্থান। শরীর ও মন তেজস্বান্ ও স্ফূর্ত্তিমান রাখিতে হইলে, শরীরপরিচালন একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইংরেজদিগের অনুকরণে আজ কাল আমাদিগের মধ্যে

ব্যায়ামচর্চ্চা ও বিবিধ প্রকার শ্রমসাধ্য ক্রীড়া কৌশল অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ সমস্ত ব্যাপার ফলপ্রদ কিনা, সে সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাঁহারা বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় তাঁহারা উল্লিখিত ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে ক্ষতি নাই। দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তির উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে হস্তপদাদি ভগ্ন হইতে পারে, ও শরীরের স্থান বিশেষে আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা হইয়া উঠে। আবার অনেকেই ঐ সমস্ত ক্রীড়ায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং জনসাধারণের অঙ্গ সঞ্চালন পক্ষে ভ্রমণ বা সন্তরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ততঃ দুই মাইল পথ ভ্রমণ করিলে যথেষ্ট অঙ্গসঞ্চালন হইল। আবার স্নানের সময় কিছুকাল সন্তরণ করিতে পারিলে হস্তপদাদির প্রচুর পরিচালনা হয়। সহস্র কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও যে আমরা শরীরের উন্নতির জন্য এই অল্পমাত্র সময় ব্যয় করিতে পারি না তাহা নহে। প্রাতঃভ্রমণে নির্ম্মল বায়ু সেবন হয়, এবং বন্ধুগণের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ায় পরস্পর মধুরালাপে পরমসুখে সময় অতিবাহিত হয়। সুতরাং ভ্রমণজন্য কেবল শরীরের সুস্থতা সম্পাদিত হয় তাহা নহে, ইহাতে অন্তরেও অনুপম আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই কেবল অলসতার বশবর্ত্তী হইয়া জাগ্রতাবস্থায় শয্যোপরি উপাধান অবলম্বন করতঃ জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিবেন; বিনা ব্যয়ে লভ্য এরূপ রমণীয় সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবেন না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, আহার, পরিষ্কৃততা ও অঙ্গচালনা শরীররক্ষার এই ত্রিবিধ উপায় সর্ব্বপ্রধান। আরও অন্যান্য অনেক গুলি নিয়ম আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করা হইল না। উল্লিখিত নিয়মত্রয় যথারীতি প্রতিপালিত হইলে সুস্থ ও সবলশরীরে থাকিয়া দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ এই সর্ব্বশুভসাধনভূত শরীরের বিনাশে প্রবৃত্ত হন। উদ্বন্ধন ও বিষপান প্রভৃতি দ্বারা আত্মহত্যা না করিলেও, দুষ্প্রবৃত্তির দাস হইয়া তাঁহারা সচরাচর এরূপ কদর্য্য কার্য্যে রত হন, যে তাহাতেই তাঁহাদিগের দেহ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত ও অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাও এক প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মহত্যা। জনক জননীর বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন, উদীয়মানযৌবনপ্রভাব কতশত যুবক স্বেচ্ছায় দুষ্প্রবৃত্তির পাপপঙ্কে লিপ্ত এবং ক্রমশই উহার গভীরতম অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইতেছেন; পরিশেষে বহুবিধ অচিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে সমাহিত হইতেছেন।

যে সমস্ত অবৈধ আচরণে শরীরের ক্ষয় ও অকালমৃত্যু আনয়ন করে, পানদোষ তাহার সর্ব্বপ্রধান। আজকাল দেশের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, যে, দ্বাদশবর্ষ বয়স অতিক্রম করিতে না করিতেই কোন কোন বালক পানপাত্রের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পানদোষও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে দুর্দ্দম্য মদ্যপায়ী হইয়া কাণ্ডাকাণ্ডবিচারশূন্য নরাকার পশু হইয়া উঠে। পানাতিশয্যনিবন্ধন অতি

শীঘ্রই রোগাক্রান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া পশুভাবের তিরোধান করে।

ইউরোপীয় প্রাজ্ঞ ভিষগ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে মদিরা পান মাত্রই উহার সুবাসাব মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। তাহাতে জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্বভাবতই মত্ততা জন্মে। সুরাপায়ী ব্যক্তি মত্ত হইয়া কি না অকরণীয় কার্য্য করিয়া থাকে? হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যাহাতে জ্ঞানশক্তির বিলোপ করে, যাহাতে উন্মত্ততা আনয়ন করিয়া মনুষ্যকে পশুবৎ করিয়া তুলে বিবেকবান্ মানবগণ কেন যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই প্রাণবিনাশী বিষপানে প্রবৃত্ত হন বুঝিতে পারি না। কতদিনে এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে, যে যুবকগণ এই অস্পৃশ্যহলাহলস্পর্শবিবর্জ্জিত হইয়া ধীবমনে ও সুস্থ শরীরে শুভকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, এবং পানদোষ পরীহার পূর্ব্বক পুরুষার্থ প্রবর্ত্তক শরীররক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইতে শিক্ষা করিবেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে যথানিয়মে আহার প্রভৃতি যেমন শরীর রক্ষার অনুকূল পানদোষ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি আবার তেমনি শরীর রক্ষার প্রতিকূল। অতএব দেহরক্ষা করিতে হইলে, যথাবিধি আহারাদি গ্রহণ ও পানদোষ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। চতুর্ব্বর্গলাভের দ্বার স্বরূপ এই দেহকে যিনি রক্ষা করেন, তাঁহার সমস্তই রক্ষিত হয়। আর স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি ইহার বিনাশে প্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত বিনাশ করিতে পারেন। দেহরক্ষা অতি প্রশংসনীয় ধর্ম্মসাধন; আর দেহনাশ যৎপরোনাস্তি গুরুতর পাপানুষ্ঠান।

যে মহাকবির মধুময়ী লেখনী হইতে এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানীয় উপদেশ পূর্ণ শ্লোকপাদ প্রসূত হইয়াছে, উদ্দেশে তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

আশা (২)

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস-নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস,
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসার-চক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থির ভাবে, চলিত না হায়।
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যত-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল

যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজি করে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।
ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতি মূর্ত্তি! কাঙ্গাল-শরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ-আধার,
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপণ; রুগ্ন কলেবর;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

আশা (৩)

চিনেছি তোমারে মোরা চিনেছি কামিনি।
ভুবনমোহিনী তুমি আশা মায়াবিনী।
ধন্য শক্তি! ধন্য মায়া! ধন্য লো তোমার
আধ-হাসি-হাসি মুখ! আজি অভাগার
তাপিত হৃদয় ভাল নিলে ভুলাইয়া;
মায়াবিনি! চমৎকার এসেছ সাজিয়া!
আশ্চর্য্য তোমার মায়া! তোমারি কারণে

রণে বনে থাকে নর হরষিত মনে;
সর্ব্ব-গ্রাসী কাল যবে সব লয় হরি,
বিপদ তামসী হবে ঘোর ভাব ধরি
একে বারে দশ দিক্ করে আচ্ছাদন,
দারিদ্র্য দুর্দ্দিন যবে, ঘোর দরশন,
শিরোপরে শত বজ্র হানে নিরন্তর,
সমগ্র জগত যবে হ'য়ে সমস্বর,
বৈরিভাবে প্রতিকূলে সাজিয়া দাঁড়ায়,
সেই কালে মায়াবিনি! দেখিয়া তোমায়
অকাতরে থাকে নর হৃদয় ধরিয়া;
তোমারি কথাতে সব থাকে লো ভুলিয়া।
আবার যতেক ক্লেশ বিপুল ভুবনে,
সুমুখি। দশাংশ তার তোমারি কারণে;
একি খেলা! একি লীলা! একি চমৎকার!
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য মায়া! করি নমস্কার।

সন্ধ্যা।

নীরব সংসার। এবে তমোবাস পরি
আইলা রজনী যেন মৃত্যুর কিঙ্করী।
ধীরে ধীরে পদ ক্রম করি নিশি যায়,
নিবিড় তমসাঞ্চল পশ্চাতে লোটায়;
যমের ভগিনী নিশি কালিন্দী-সোদরা,

পদার্থপুঞ্জ ভয়ে ভীত অভিভূত যরা।
ক্রমে স্তব্ধ চরাচর; কুলায়ে গোপনে
নীরবিল বিহঙ্গম; রাখিয়া যতনে
আপন শাবকগণে পাখার ভিতরে,
পাখাতে ঢাকিয়া মুখ নিদ্রা-ভোগ করে;
আপন আবাস-গৃহে, করিয়া শয়ন,
নয়ন মুদিয়া গাভী করে রোমন্থন;
জননীর কোলে শিশু অঘোরে ঘুমায়,
আপনি প্রকৃতি-দেবী বিচেতন প্রায়,
সকলেই গাঢ় নিদ্রা করে অনুভব,
সুস্থির স্তিমিত সব, নাহি কোন রব,
কোলাহল কর্ণভেদ নাহি করে আর;
গভীর ধ্যানেতে যেন বসিল সংসার।
চরাচর বিচেতন প্রকৃতির কোলে,
কেবল দাঁড়ায়ে তরু বায়ুভরে দোলে,
খস্ খস্ খস্ শব্দ হয় ঘন ঘন,
বুঝিবা বিরল পেয়ে এক প্রাণ মন
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তরু ঈশ-গুণ গায়,
কেবল শ্বাপদ কুল আহার চেষ্টায়
ভ্রমিছে গহন মাঝে, মহা ভয়ঙ্কর,
সচকিত বনস্থলী কাঁপে থর থর।